বঙ্কিম সমালোচনা

দুর্গেশনন্দিনী বা বিজারজা

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিলে মূল্য ফিরাইয়া দিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এতদ্দ্বারা সবিনয়ে নিবেদন করা যাইতেছে যে,—যেন দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই, এই পুস্তকখানি উত্তমরূপে পাঠ না করিয়া তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ না করেন। দেশদূত বসুমতী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, নায়ক, মোসলেমহিতৈষী প্রভৃতি সংবাদপত্র সকল যেন, দেশের মস্তিষ্কদোষ সংশোধনে অগ্রসর হইয়া, সত্য হিতৈষণার পরিচয় দেন। বাহ্যিক নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া এমন মনে করিবেন না যে, আমরা কোন মন্দ অভিসন্ধি লইয়া, দেশের দুরাত্মা সাজিয়া হিন্দু মুসলমানে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছি। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে, দেখিবেন—আমরা বঙ্গবাসীর মস্তিষ্ক ক্ষেত্রে চাষ দিয়া ঘাসের স্থলে শস্যশ্যামলা করিতে দাঁড়াইয়াছি এবং সেই জন্য দেশহিতৈষী-দিগের সাহায্য চাহিতেছি।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি

কর্তৃক বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1922.

7.11.42
1922
1827
4.12.1922

বঙ্কিম সমালোচনা

দুর্গেশনন্দিনী বা ত্রিজারজা

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিলে মূল্য ফিরাইয়া দিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এতদ্দ্বারা সবিনয়ে নিবেদন করা যাইতেছে যে,—যেন দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই, এই পুস্তকখানি উত্তমরূপে পাঠ না করিয়া তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ না করেন। দেশদূত বসুমতী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, নায়ক, মোসলেমহিতৈষী প্রভৃতি সংবাদপত্র সকল যেন, দেশের মস্তিষ্কদোষ সংশোধনে অগ্রসর হইয়া, সত্য হিতৈষণার পরিচয় দেন। বাহ্যিক নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া এমন মনে করিবেন না যে, আমরা কোন মন্দ অভিসন্ধি লইয়া, দেশের দুরাত্মা সাজিয়া হিন্দু মুসলমানে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছি। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে, দেখিবেন—আমরা বঙ্গবাসীর মস্তিষ্ক ক্ষেত্রে চাষ দিয়া ঘাসের স্থলে শস্যশ্যামলা করিতে দাঁড়াইয়াছি এবং সেই জন্য দেশহিতৈষী-দিগের সাহায্য চাহিতেছি।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি

কর্তৃক বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1922.

FEMALE FRIEND

(ফিমেল ফ্রেণ্ড।)

এই অনন্ত উপকারী মহৌষধির সেবনে ঋতুদোষ, বাধক শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রমণীরোগ সকল সমূলে নির্ম্মূলিত হয়। প্রসবের পর এই ঔষধ সেবন করিলে সেই জননীতে স্থতিকাসম্ভব কোন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে না। প্রসবের পূর্ব্বে জরায়ু বা পো-নাড়ীর মুখ খুলিয়া যাইবার পর এই ঔষধ উচ্চ মাত্রায় পান করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসব করিবে। প্রথমবারের প্রসূতিকে এ ঔষধে প্রসব না করানই উচিত। তবে ভাল ধাত্রীর হাতে হইলে ক্ষতি হইবে না। এই ঔষধ গৃহে গৃহে সঞ্চিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিরারোগ্য অর্থাৎ বহুকালের পুরাতন রোগ সকলের বিবরণ সহ ৫৲ টাকা ফিঃ পাঠাইলে ডাঃ হোসেন সাহেব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঔষধ ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয়। আমাদের ঔষধের মূল্যও বেশী ক্রিয়াও বেশী।

হাসেম কাসেম এণ্ড কোং,
৬৩ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দরবার প্রেস

দরবার প্রেসে সকল প্রকার জবের কাজ অতি সুন্দর রূপে ও সুলভ মূল্যে ছাপা হইয়া থাকে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন। বাঙ্গালা ইংরাজী ও উর্দ্দু সকল প্রকার টাইপ প্রচুর পরিমানে মজুত আছে।

S. A. HASHEM, B. A.
63, Collin Street, Calcutta.

[…]AL LIBRARY 18 APR 24

CALCUTTA.

বঙ্কিম সমালোচনা

দুর্গেশনন্দিনী

বা

ত্রিজারজা !

---

১ ✱ বিসমাল্লায় গলত। ✱ ১

এই অনন্ত ভূমণ্ডলে, আমরা যতপ্রকার নরনির্ম্মিত সামগ্রী বস্তু বা পদার্থ দেখিতে পাই, সে সমুদায়ই মানব-মস্তিষ্কজাত কল্পতরুর ফল। বস্ত্রালয়ে—সহস্র-প্রকার বস্ত্র, দর্জ্জির দোকানে সহস্রপ্রকার কাট ছাট, মিষ্টান্নের দোকানে—সহস্রপ্রকার মিষ্টান্ন, ঐরূপ—লৌহ স্বর্ণ, আবাস-নির্ম্মাণকর দ্রব্য, পুস্তক, খেলনা তৈজসপত্র প্রভৃতির আলয়ে আমরা যে সকল কোটী কোটী, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ দ্রব্য দেখিতে পাই, সে সমুদায়ই মনুষ্য-কল্পনাপ্রসূত প্রসূন। পরন্তু মনুষ্য-কল্পনার বিস্তৃতিটা যে কতদূর, পাঠক একবার তাহা মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবেন। অতএব সমগ্র জগৎটাই কল্পনার বলে চলিতেছে, কল্পনার বলেই আজ ইউরোপ ও আমেরিকাদি দেশ উজ্জ্বল হইয়াছে। কল্পনার দোষেই আজ আমাদের সোনার ভারতের গালে কালি পড়িয়াছে। কল্পনার দোষে আমরাই ঐ কালি মায়ের মুখে মাখাইতেছি। নীচ প্রকৃতির লোকেরাই সহোদরকে "শালা" বলিয়া গালি দেয় এবং অনুক্ষণ ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদে উন্মত্ত থাকিয়া সংসারধর্ম্ম নষ্ট করিয়া থাকে, আমরাও মায়ের তদ্রূপ সন্তান। আমরা আমাদের মহাপুরুষদের মধ্যেও ঐরূপ নিজের নিন্দাবাদ নিজ মুখে করিতে অবিরত শুনিতেছি। আমরা উজ্জ্বল মস্তিষ্ক হইব মনে করিয়া ঐ সকল মহাপুরুষদের গালাগালিপূর্ণ গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া কেবল গালাগালিরই শিক্ষা পাইতেছি এবং ক্রমশই "কাবাড়ী" নিকৃষ্ট ভাষায় মুখ ছাড়িতেছি। ধন্য আমাদের শিক্ষা, ধন্য আমরা ও আমাদের "ওস্তাদ।"

মহাত্মা স্কটের 'আইভান হো' নামক গ্রন্থের কল্পনাগুলি গ্রহণ করিয়া, নভেল

ঠাকুর, যেমন তাঁহার গ্রন্থখানির নাম 'দুর্গেশনন্দিনী' রাখিলেন, অমনি তিনি "বিস্‌মাল্লাতেই গলত' করিলেন। একটা জারজা রমণীর কন্যাকে, দুর্গেশনন্দিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়া, ঠাকুর এই গ্রন্থগত শৈলেশ্বর ঠাকুরের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন না কি ? আমরা এই অসার ও হিন্দু দেবদেবীদের প্রতি অশ্লীল-ইঙ্গিতপূর্ণ গ্রন্থের প্রশংসার কান পাতিতে পারি না। ঠাকুর যেন মেঘের উপর বিজলী রেখায় 'কাবাড়ি' নিকৃষ্ট ভাষায়, হিন্দুর সুন্দর চরিত্র সকল জঘন্য করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। হিন্দুর হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নাই, তাই তাঁহারা দূরস্থিত মেঘমালায়, কুৎসার দর্শন না পাইয়া, কেবল দেবদেবীর মনোহর চিত্রাবলি দর্শন করিতেছেন, এবং আনন্দে উন্মত্ত হইয়া লেখককে মাথায় তুলিয়া নাচিতেছেন।

ঠাকুরের ১৪ খানি নভেলের মধ্যে, দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় নিকৃষ্ট নভেল, আর দেখা যায় না।—ইহাতে তিনি তাঁহার নিতান্ত নীচাভিরুচির পরিচয় দিয়াছেন। ঠাকুর যেন যাদুকরী মন্ত্রে বিমুগ্ধ করিয়া, তদীয় পাঠকদের এক বংশদণ্ডের উপর বসাইয়া নাচাইয়া নাচাইয়া অভিনয় করিয়াছেন। ঠাকুরের সেই অশ্লীল কার্য্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আরোহীরা আনন্দধ্বনি করিতেছে। যদি কোন মুসলমান, মস্‌জেদ-মধ্যে এইরূপ লম্পটলীলা দেখাইয়া গ্রন্থ লিখিতেন, মুসলমানেরা তাঁহাকে নিশ্চয়ই 'কতল' করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।—হিন্দুরা ঐ গ্রন্থকে স্কুলপাঠ্য ও অভিনয় যোগ্য করিয়া দিয়া প্রকারান্তরে পূজা করিলেন। ফলে বালকদলের উর্ব্বর মস্তিষ্কে বর্ব্বরতার বীজ উপ্ত হইতে লাগিল। আমরা অনেকের মুখে বলিতে শুনিয়াছি যে, ওস্মান খাঁ, কৎলু খাঁয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আয়েশা তাঁহার কন্যা।—বিমলার ন্যায় পত্নী এবং তিলোত্তমার ন্যায় কন্যা পাইবার অভিলাষ বোধ হয় কেহই করেন না, অথচ ঐ নারীদ্বয়কে উত্তম বলিতেও ছাড়েন না। অতএব পাঠকদের মাথা কেমন সুন্দর ভাবে বিকৃত হইয়াছে তাহা, চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নহে কি ?—এই বঙ্কিম-কল্পনার অনুগামী হইয়া বঙ্গের বহু বীরাঙ্গ পুরুষ, বঙ্কিমকল্পী হইয়া দেশের যে কত অপকার ও অত্যাচার করিয়াছে, তাহা অবশ্যই সকলের মনে আছে।

ঠাকুর তাঁহার পাঠকবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া দুর্গেশনন্দিনীরূপ এক 'কেক' নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন। ময়দা, মাখন, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, কুমড়ার মোরব্বা মুর্গিডিম্ব, সর্করা এবং সিটরান আদি আনীত হইল। ঠাকুর 'নোলা' সামলাইতে না পারিয়া, শৈলেশ্বরের মন্দিরে বসিয়া চিনিটা গুলিয়া খাইলেন এবং তৎস্থলে,

বিমলা ও তিলত্তমারূপ কোত্রা গুড় ঢালিয়া জগৎসিংহরূপ ময়দাটিকে বিনষ্ট করিলেন। তার পর ঠাকুর মুর্গিরডিম্বগুলি "নোলায়" ফেলিয়া দিলেন। এবং তৎস্থলে এক কাল্পনিক "ঘোড়ার ডিম্ব" ভাঙ্গিয়া মিশাইলেন।—অর্থাৎ ঘোড়ার ডিম্ব যেমন এক সৃষ্টি ছাড়া কল্পনা ওসমানকে কৎলুখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলাও তেমনি 'গাঁজাখুরী' কথা।—তার পর ঠাকুর, আয়েশারূপ চাষার চালের ছাঁচিকুমড়ার মোরব্বা লইয়া পাঁদাড়ে মানতলায় বসিয়া খাইলেন, এবং গোপনে মানডাঁটা কুচাইয়া, কেকের গোলায় মিশাইয়া দিলেন। মাখনরূপ হিন্দু-ধর্ম্মটির কতকটা কল্পনায় শান দিবার জন্য মাথায় দিলেন। এবং তৎস্থলে গোবররূপ অভিরাম স্বামীকে ঐ গোলার সহিত গুলিয়া দিলেন। কাবুলীমেওয়ারূপ কৎলুখাঁর বিরেচক শক্তিবাহী সৈন্যদলকে হজম করিতে পারিবেন না বলিয়া, খাইতে পারিলেন না। গোলার সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইল। এইরূপে গোলা প্রস্তুত করিয়া, তাহা খোলায় ফেলিয়া, একপ্রকার 'ধুম্‌শি সেকা' করিয়া লইলেন। এবং সেই কেক্ ফাঁক ফাঁক করিয়া কাটিয়া, সোনার বাসনে সাজাইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে খাইতে দিলেন। গোবরের দুর্গন্ধে, মানডাটার কুটকুটিতে, এবং ঘোড়ারডিম্বের অসারত্বে, ভদ্রলোক মাত্রই নাক বাঁকাইয়া কেক ফেলিয়া পলায়ন করিলেন। কেবল কতকগুলা চাষানুরূপ পিঠাখোর মূর্খ, ভাষারূপ সোনার থালে সাজান দেখিয়া মুগ্ধচিত্ত হইয়া, "হুপহাপ" করিয়া খাইতে লাগিলেন।

২ ✱ শিবমন্দিরে লম্পট লীলা। ✱ ২

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট, আক্‌বার বাদসার শাসনকালে উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুরের শাসনভার, নবাব কৎলুখাঁর করে সমর্পিত ছিল। এই সময়ে সমগ্র বঙ্গরাজ্যের শাসন সম্বন্ধে বিবিধপ্রকার গোলযোগ উদিত হয়; এবং তাহা, আকবর বাদশা কিছুতেই দমন করিতে না পারায়, নবাব কৎলুখাঁ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য, বীরাগ্রগণ্য রণপণ্ডিত রাজা মানসিংহকে, বঙ্গরাজ্য সংশোধন করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। মানসিংহ সসৈন্যে বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া, দ্বারকেশ্বর নদী-তীরে, বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী স্বীয় শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করেন।

গড়মান্দারণাধিপতি, বীরেন্দ্রসিংহ, নবাব কৎলুখাঁর, একজন করদ রাজা ছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ ইতঃপূর্ব্বে সম্রাট আকবরের নিকট একজন সেনাপতিরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত হইয়া এই সময়ে গড়মান্দারণে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কৎলু খাঁ, বীরেন্দ্রের নিকট হইতে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে, সৈন্য এবং অর্থবলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বীরেন্দ্র ভাবিলেন দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিলে সম্ভবতঃ নবাবীপদটা তাঁহারই শিরে অর্পিত হইতে পারে। পরন্তু তিনি কৎলুখাঁর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বরং কৎলুখাঁকে দশটা কটুকথা শোনাইয়া দিলেন। কৎলুখাঁ ক্রোধান্বিত হইয়া, গড়মান্দারণের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কৎলুখাঁর সেই অত্যাচার সমূহ দমন করিবার ইচ্ছায়, মানসিংহ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র জগৎসিংহকে, একশত সৈন্যসহ তথায় পাঠাইয়া দেন।

কুমার জগৎসিংহ সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কৎলুখাঁর সিপাহীরা ঐ সকল গ্রামবাসী স্ত্রী ও পুরুষদিগের উপর, পাশবিক অত্যাচার করিতেছে। জগৎসিংহের সেনাবল সামান্য হইবার কারণে তাহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না। তখন কৎলুসৈন্য ইহাদিগকে আক্রমণ করিল। সামান্য যুদ্ধ হইবার পর জগৎসিংহের সেনাদল পলায়ন করিল, এবং সেনাপতি জগৎসিংহও পশ্চাৎপদ হইলেন। তিনি পুনরায় যুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া, এই সংবাদ পিতৃপদে নিবেদন করিবার জন্য, দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলেন। তাঁহার সৈন্যের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। (পাছে বিমলা ও তিলোত্তমা এই জারজা ও গণিকারূপিণী রমণীদ্বয়ের চরিত্রের উপর কাহারও সন্দেহ জন্মায় সেই জন্য, নভেল ঠাকুর উপরের কথাগুলি উল্লেখ না করিয়া, এইস্থল হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বিমলা জগৎসিংহকে দেখিবা মাত্র চিনিয়াছিলেন। কেন না ঠাকুর বলিয়াছেন—"বিমলা অনুমান করিলেন যে, যুবকের বয়স ২৫ বৎসরের দুই এক মাস অধিক হইবে।" আবার পাছে তাঁহার ঐ ইঙ্গিত, পাঠকেরা বুঝিয়া লন সেই কারণে,—আবার যখন তিনি প্রতিবন্ধকতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া জগৎসিংহের নাম প্রকাশ করিলেন তখন,—উক্ত রমণীদ্বয়কে অকস্মাৎ চমৎকৃতা ও স্তম্ভিতা করিয়া দিলেন। এরি নাম মেঘের উপর বিজলীর লেখা, একেই বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। আমরা ঠাকুরের গুপ্ত রহস্যগুলি নিম্নে প্রকাশ করিয়া বলিব। জারজার কন্যা দুর্গেশনন্দিনী হইবে, ইহাতে দেবতাকে গালাগালি করা

হয় না কি? মুসলমানেরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাদের প্রাণে এ কথা বাজিতে থাকে, তবে হিন্দুর প্রাণ কিরূপে সহিবে?

জগৎসিংহ অশ্বারোহণে পথ পর্য্যটন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক নিভৃত-স্থলে শৈলেশ্বর ঠাকুরের মন্দির। সেই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ঠাকুরের কল্পনা-রাজ্য হইতে ঝড়বৃষ্টি আনীত হইল। আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া বিপ্লবজনক ঝড় ও বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে, সেই অশ্বারোহী অতি কষ্টে গমন করিয়া মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গদ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। বহু চপেটাঘাতেও দ্বার খুলিল না। (কিন্তু ঠাকুর সেই মন্দিরের মর্য্যাদা নষ্ট করিলেও) যুবক ধর্ম্মভয়ে মন্দির দ্বারে পদাঘাত না করিয়া বলপ্রয়োগে অর্গল-চ্যুত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বীরবর কি ঝড়ের প্রকোপে পড়িয়া মন্দিরের দ্বার ভাঙ্গিলেন, অথবা দ্বার বন্ধ দেখিয়া ভিতরে নিশ্চয়ই রমণী আছে ভাবিয়া সে কাজ করিলেন। যদি ঝড়ের প্রকোপে হয় তবে তিনি বীর নহেন, আর যদি রমণীর লালসায় হয় তবে তিনি কামুক।)

মন্দিরমধ্যে আলো জ্বলিতেছিল। জগৎসিংহ দেখিলেন দুর্গমধ্যে দুই জন রমণী, তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, একটির উপর একটি হইয়া ভয়ত্রস্ত ভাব সমূহ প্রকাশ করিয়া বসিয়া আছেন। কুমার তাঁহাদের অভয়দান করিতে, তাঁহারা সাহস পাইলেন। ক্রমশঃ পরিচয়ে জানা গেল যে আগন্তুক কুমারের নাম জগৎসিংহ, কিন্তু রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন, নাম শুনিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বচনে চিনিয়াছিলেন, এবং অন্য রমণীর সহিত আকারেঙ্গিতে অনন্দপ্রকাশ করিতেছিলেন। যেন তাঁহারা যাঁহার অনুসন্ধানে ছিলেন, তাঁহারই দর্শন পাইয়াছেন। যেন তাঁহাদের মহামানস এতদিনে সফল হইয়াছে।

রমণীদ্বয়ের পরিচ্ছদ অতি উচ্চ ধরণের, একজনকে রাজমহিষী এবং অপরাকে রাজকন্যা বলিয়া প্রতীতি হয়। উভয়েই অলৌকিক রূপবতী। বয়স্থার নাম বিমলা, ইনি জারজা হইলেও বীরেন্দ্রসিংহের উপপত্নী। কনিষ্ঠার নাম তিলোত্তমা ইনি বীরেন্দ্রসিংহের ঔরসে এক জারজার গর্ভজাতা কন্যা। (নভেল ঠাকুর আমাদের চক্ষে ধূলা দিয়া এই অপবিত্র কন্যাকে দুর্গেশনন্দিনী করিয়া দেখাইবার জন্য; নারীদ্বয়ের চরিত্র, সতীত্ব এবং রূপরাজ্য এরূপ উচ্চভাব, ভাষা ও ধরণে দেখাইয়া আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছেন যে, আমরা উহাদের জঘন্য জন্মকাহিনীর দিকে

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, জ্যোতিপ্রিয় পতঙ্গের ন্যায় ঠাকুরের জ্যোতিতে পড়িয়া পুড়িয়া মরিলাম। রমণীদ্বয়কে শিবপত্নী অপেক্ষা সচ্চরিত্রা, দুর্গা অপেক্ষাও সুন্দরী এবং সাবিত্রী অপেক্ষা সাধ্বী মনে না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। তিলোত্তমার বয়স এখন যোল বৎসর। এখনও তাহার বরপাত্র যোটে নাই, যুটিবার কথাও নহে। শঠশ্রেষ্ঠা বিমলা, তিলোত্তমার বিবাহের জন্য অবিরত মাথা ঘামাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। গত তিন বৎসর হইতে তাঁহাকে নয়ন ঘূর্ণন, ব্রীড়া সঞ্চালন, আনন বিকীর্ণন, হাস্য প্রদর্শন, অঙ্গভঙ্গী করণ, ঠরশর বিক্ষেপণ এবং আকারেঙ্গিতে মনোগত ভাব প্রকাশ করণাদি; ব্যবসায়ী রমণীরুচ্য-শিক্ষাসমূহ দিয়া আসিতেছেন। তিলোত্তমাও ঐ সকল বিষয়ে, সুশিক্ষিতা ও শিকারপটু রমণীদলের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; তবে কিনা বনে আর হরিণ নাই, শিকার করেন কাকে? গড়মান্দারণের হরিণ সকল অত্যন্ত চতুর হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এই চেনা ব্যাধিনীর ছায়াও মাড়াইতে চায় না।

হিন্দুসমাজে তিলোত্তমা যে শ্রেণীর কুলবতী, রাজপুত সমাজে জগৎসিংহও প্রায় সেই শ্রেণীর কুলীনপুত্র। জগৎসিংহের পিতৃস্বসার নাম যোধাবাই, তিনি কুমার সলিমের বেগম। সেহেতু জগৎসিংহের গোষ্টি, রাজপুত সমাজের অন্তর্গত ছিল না। সেই জগৎসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়াছেন। বিমলা এই জগৎসিংহকে মনে মনে তিলোত্তমার বরপাত্র স্থির করিয়াছেন। কোন গতিকে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমায় দেখা করাইয়া দিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধ হইবে। তিলোত্তমা তাহার শিকার-পটুতা বলে, নিশ্চয়ই জগৎসিংহকে শরসন্ধান করিয়া লইতে পারিবে, সে কথায় তাঁহার কোনই সন্দেহ ছিল না।

নয়নবাণে আহত করা, এবং বিবাহের পূর্ব্বে বাসর সাজান ভিন্ন, তিলোত্তমা বিক্রয় হওয়া অসম্ভব। পাত্রের পিতামাতা ও আত্মীয়বর্গকে জানাইয়া যথা নিয়মে তিলোত্তমার বিবাহ হইতে পারে না। পরন্তু যে সকল কৌশলে তাহার মাতা ও পিসী বিক্রয় হইয়াছিল, বুদ্ধিমতী বিমলা তিলোত্তমার জন্যও সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। (নভেল ঠাকুর প্রথমতঃ আমাদিগকে জ্যোতি-অন্ধ করিয়া লইয়া, গ্রন্থের অনেক দূরে গিয়া বিমলার পত্রে, তাঁহাদের পবিত্র বংশের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাহা যথা সময়ে দেখাইব। এই তিলোত্তমাকে দেবকন্যা বা দুর্গেশনন্দিনী বলিয়া, ঠাকুর যে কিরূপে দেব-দেবীগণের মর্য্যাদাভ্রষ্ট করিয়াছেন এবং সমগ্র সম্প্রদায়কে

প্রকারান্তরে উদ্‌ভ্রান্ত জাতি বলিয়াছেন, তাহা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি ? কৌশল জানেন বলিয়া সমগ্র সম্প্রদায়কে তাঁহার বংশদণ্ডে বসাইয়া নাচাইবেন, ইহা বোধ করি পথের পথিকের নয়নেও সহ্য হইবার কাণ্ড নহে। এইরূপ অসংসাহিত্যের অনুবর্ত্তী হইয়া দেশ উচ্ছন্নে যাইতেছে না কি ?

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন। "আপনাদের নিবাস !" ষোড়শী রূপসী তিলোত্তমা, তাঁহার বস্ত্রবিদারী রূপরাশি বসনাবৃত করিয়া, এক অপরূপ ভঙ্গিমা ও আকারেঙ্গিতসহ, বিমলাকে উত্তর করিবার আদেশ করিলেন। বিমলা সেই ইঙ্গিতমতে উত্তর করিলেন "গড়মান্দারণ।"

জগৎসিংহ চমৎকৃত হইয়া ভাবিলেন। "ইহারা তো সাধারণ রমণী নহে !" পরন্তু প্রকাশ করিয়া বলিলেন। "গড়মান্দারণের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সকল তো কৎলুখাঁর অসংখ্য সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। তাহারা তো বিশেষ করিয়া রমণীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। এমন সময়ে আপনারা কি করিয়া সেই সৈন্যপরিবেষ্টিত স্থল অতিক্রম করিয়া এখানে আসিলেন ?—অবশ্যই কোন মহৎ কার্য্যের অনুরোধে পড়িয়াই এমন সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা মানি, কিন্তু তাহা জানিতে পারি না কি ?"

জগৎসিংহের প্রশ্নটি রমণীচরিত্রের জন্য কলঙ্ক বিকাশী হইলেও ; যাঁহারা ঐরূপ সৈন্যবিমণ্ডিত স্থল পার হইবার কৌশল জানেন ; তাঁহাদের ন্যায় চতুর বুদ্ধিমতীরা জগৎসিংহের এই প্রশ্নের উত্তর করিতে অক্ষমা হইতে পারেন না। বিমলা উত্তর করিলেন। "আশা আছে বলিয়া সংসার চলিছে। আশা যখন যাহাকে ডাকে, তখন সে ব্যক্তি, ইহা অপেক্ষাও বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া, আশাস্থলে গমন করিয়া থাকে।

(পাছে পাঠকগণ বুঝিতে পারেন যে বিমলা ও তিলোত্তমা, পথিমধ্যে ভ্রমর দংশন জ্বালা সহ্য না করিয়া শৈলেশ্বর ঠাকুরের মন্দির পর্য্যন্ত আসিতে পারেন নাই। সেই আশঙ্কায়, কেমন কৌশলের সহিত, ঠাকুর ঐ কথাটি কিরূপ 'ফিঁকে' করিয়া যবনিকা পতনের পর বিবৃত করিয়াছেন। যাঁহারা চতুর চোর, তাঁহারা চোখ বন্ধ করিয়া সন্দেশ খাইলে, কেহ তাহা দেখিতে পায় না। এ কথা হয় তো অনেকেই অনুমোদন করিবেন না। কিন্তু নভেল ঠাকুর অবিরত চোখ বুজিয়া সন্দেশ খাইয়াছেন, তথাচ তাঁহার অগণিত সঙ্গীরা দেখিতে পান নাই। কেন দেখিতে পান নাই পরে তাহা শুনুন।

(ঠাকুর যখন তাঁহার সপ্তগ্রামের প্রজাবর্গকে সঙ্গে লইয়া, তদীয় সপ্ত তালুক ভ্রমণে গমন করেন তখন প্রজাবর্গকে বুঝাইয়া দেন যে, পথিমধ্যে, ভাল মন্দ, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র, দেবদেবী আদি অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কাহাদের সহিত কিরূপে কথা কহিতে হইবে কোথায় কি ভাবে দাঁড়াইতে হইবে, তোমরা তাহা জাননা ; অতএব আমি যখন যাহা করিব বা করিতে আদেশ করিব, তোমরা তখন তাহাই করিও।" প্রজারা তাহাই স্বীকার করিয়া ঠাকুরের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। ঠাকুর কাশিলে তাহারাও কাশে, হাসিলে হাসে, মুখভঙ্গী করিলে তাহাই করে। সন্দেশের ভার ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন। "ঐ অশ্বথ বৃক্ষে এক দেবতা থাকেন ; এইখানে যোড়হাত করিয়া মুদিত নয়নে পথ চলিতে হয়।" সকলে তাহাই করিল। ঠাকুর অমনি যোড়া কতক সন্দেশ রসনায় ফেলিয়া দিলেন। আবার একস্থলে যাইয়া বলিলেন। "এই ভূগর্ভে এক দেব মন্দির আছে, সকলে নয়ন বন্ধ করিয়া দণ্ডবৎ হও।" ঠাকুর আবার যোড়া কতক সন্দেশ পার করিলেন। এই জন্য আমরা ঠাকুরের চুরি ধরিতে পারি না।)

(আমরা বিমলা এবং তিলোত্তমাকে দেবীরূপিণী রমণী বলিয়া স্থির করিতে পারি না। এবং ইতিহাসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া ও ওসমানকে কৎলুখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রও বলিতে পারি না। সেহেতু আয়েশার জন্য, ওসমান ও জগৎসিংহে দ্বন্দ্ব হইতেও পারে না। এক কথায় এই বলিতে হইবে যে, যদি ঠাকুরের উজ্জ্বল মস্তিষ্কের বিজলীপ্রভ কল্পনা পরিত্যাগ করি, তবে আমাদিগকে সমুদায় পুস্তকখানিই, আমাদের কল্পনায় সাজাইতে হয়। আমরা সত্যের অনুরোধে তাহাই করিলাম। ভাল মন্দের বিচার পাঠকেরাই করিবেন।)

রূপবতী বিমলা জগৎসিংহকে যাহা বলিলেন। তাহা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। তিনি তখন নবীনা তিলোত্তমার নয়নবানে আহত হইতেছিলেন। তিলোত্তমা তখন তাঁহার সেই মনোহর গুণ্ঠন অবিশ্রান্ত অপসৃত করিয়া, ফুলবান স্বরূপিনী ভ্রূযুগলতলে, অঞ্জনরেখিত সুনীল নয়নজাত, কৃষ্ণ বর্ত্তুলাকৃতি ঘূর্ণিত তারারূপী শরজাল ধরিয়া, নিষ্করুণ প্রাণে যুবকের হৃদয়পিণ্ড বিদীর্ণ করিতেছিলেন। আবার যেমন নয়নে নয়ন হইতেছিল, অমনি সে নয়ন ঘুরাইয়া, বিজলী খেলাইয়া পলকে ফিরাইয়া লইতেছিলেন। আবার থাকিয়া থাকিয়া দশনে গুণ্ঠন চাপিয়া, এক অপরূপ বার্ত্তাবাহী ব্রীড়া দেখাইতেছিলেন। তাম্বুলরেখিত অধরওষ্ঠ অবিরত

মুচকি হাসির দমন দেখাইয়া, যুবককে উদাসীন করিয়া তুলিতেছিলেন। অঙ্গভঙ্গি, হস্তভঙ্গি, পদভঙ্গি, অঙ্গুলি পীড়নাদি, অস্থিভেদী শরসন্ধানে, কুমারকে জ্বরজ্বর করিয়া ফেলিতেছিলেন।

কুমার জগৎসিংহ প্রস্তর প্রতিমাবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া, সেই সুহাসিনীর মনোহর ভঙ্গিমাজাত শরজালে, স্বীয় পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণ পাখীটিকে জর্জ্জরীভূত করিতেছিলেন। কুমার বিমলার দিক পরিত্যাগ করিয়া, কুমারীর নয়নবানে "সজারু" সাজিতে উন্মত্ত হইলেন। চতুরা বিমলা বাতাস বুঝিয়া আলাপ পরিচয় স্থগিত রাখিয়া, শৈলেশ্বর ঠাকুরের পূজায় মনোযোগিনী হইলেন। কতক্ষণ স্তব করিয়া, যখন বুঝিতে পারিলেন যে, মন্দির মধ্যে আসারে নয়নবাণ বর্ষণারম্ভ হইয়াছে। সমগ্র মন্দির প্রেমরসে ভাসিয়া গিয়াছে। তখন তিনি প্রেমিকদ্বয়কে অধিকতর সুযোগ দিবার মানসে শিবমূর্ত্তিসমীপে দণ্ডবৎ হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন। সেই অবসরে, এ দিকে মনপ্রাণ শরীর আত্মাদি সমুদায় বিনিময় হইয়া, শেষ চুম্বন পর্য্যন্ত বিনিময় হইয়া গেল। (ইহা ইংরাজি কল্পনার অনুবাদ নহে কি ? courtshipটা গির্জ্জায় না হইয়া মন্দিরে।)

নভঃসদ্ ঠাকুরের আদেশে মন্দির বাহিরে ঝড়বৃষ্টি থামিয়াছে ; চন্দ্রালোকে জগন্মণ্ডল হাসিতেছে। কিন্তু মন্দির মধ্যে এখনও ঘোরতর রূপে ঝড়বহিতেছে। হৃদয়ে হৃদয়ে শিলাবৃষ্টি চলিতেছে। নয়নে নয়নে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, গুণ্ঠনরূপী মেঘমধ্যে বদন চন্দ্রমাখানি একবার বিলুপ্ত ও একবার উদ্ভাসিত হইতেছে। এইরূপ কতক্ষণ ধরিয়া ঝড়, বহিবার পর, থামিল, বিমলা তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিলেন। এবং যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন। "ঝড়বৃষ্টি থামিয়াছে। আমাদের বিদায় দিন, আমরা বাড়ী গমন করি।"

কুমার জগৎসিংহ, কুমারী তিলোত্তমার সহিত এতক্ষণ কি করিতেছিলেন, তাহা গোপন করিবার জন্য, এবং রমণীদ্বয়ের পরিচয় পাইবার মানসে, বিমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "আপনি যতক্ষণ ধ্যানমগ্না ছিলেন, আমি সেই সময়ে এক মহা সমস্যায় পড়িয়া চিন্তাশ্রিত ছিলাম। আমার সে সমস্যা এই—"আপনারা কি এমন মহা আশার-ছলনে ভুলিয়া এইরূপ সাহসের সহিত এখানে আসিয়াছেন। এ কথাটি আমার জিজ্ঞাস্য না হইলেও এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যতক্ষণ এই কথার প্রকাশ না পায় ততক্ষণ আমরা উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের নিকট অপরিচিত

থাকিব। সে অবস্থায় কেহ কাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের প্রার্থী হইতে পারেন না।—শৈলেশ্বরের পূজা তো অন্যদিন দিলেও চলিত!”

বিমলা ধীর নয়নে চাহিয়া উত্তর করিলেন। “আমার পরিচয় আমি সময়ান্তরে দিব। আমার সঙ্গিনীর নাম তিলোত্তমা। ইনি বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা। আমরা কুমার জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে, এই পথে আসিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাঁহার দর্শন পাইয়াছি; এক্ষণে তাঁহার নিকট বিদায় চাহিতেছি, তিনি দিবেন না কি?”—আমরা শৈলেশ্বরের পূজা দিতে আসি নাই।

বিমলা এইরূপ বলায়, জগৎসিংহ চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, বিমলা কি তাঁহার পরিচিতা? নৈলে কেমন করিয়া চিনিবেন। তিনিও বিমলাকে চিনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চিনিতে না পারিয়া বলিলেন।—“আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কি এমন প্রয়োজন হইল?”

বিমলা করুণার নয়নে চাহিয়া উত্তর করিলেন। “নারীজাতি স্বভাবতঃ যাঁহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করে, তিনি গর্ভজাত সন্তান না হইলেও, তাঁহাকে দেখিতে তাহার আনন্দ জন্মায়।”

কুমার অধিকতর স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন। “আপনার পরিচয় কবে জানিতে পারিব? আপনি আমাকে মানুষ করিয়াছেন, সে কৃতজ্ঞতা, কেমন করিয়া স্বীকার করিব, তাহা যে বুঝিতেছি না।”

বিমলা। “তিলোত্তমার বিবাহের পুর্ব্বে বা পরে, আমি আমার পরিচয় দিব। কিন্তু আমার পরিচয়ে আপনি সুখী হইবেন না।” আর যদি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চান তবে, দয়া করিয়া, আর একবার এই অভাগিনীকে ঐ চাঁদ মুখ খানি দেখাই-বেন।” (বঙ্কিম)

কুমার। “আমি দুই সপ্তাহের পর, একদিন অবসর করিতে পারিব। কিন্তু আপনার সাক্ষাৎ কোথায় পাইব?”

বিমলা। “আপনি কি দয়া করিয়া গড়মান্দারণে আসিতে পারিবেন না।”

কুমার। “কেন পারিবনা?”

বিমলা। “আমাদের আবাসের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, যে এক কানন আছে; রাত্রিকালে সেই খানে আসিলে আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।”

কুমার। "তাহাই হইবে।—তা' আপনার পরিচয় কত দিনে পাইব? আপনার সঙ্গিনীর পাত্র বা বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে কি?"

বিমলা। "দিনস্থির, পাত্রস্থির শৈলেশ্বর ঠাকুর বলিতে পারেন। (আর যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলিবেন কি?") এই সময়ে তিলোত্তমা বিমলার কানে কানে কি বলিলেন। তিনি কুমারের নিকট হইতে আবার বিদায় চাহিলেন। কুমার স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া বলিলেন। "তবে, আপনারাও আমাকে বিদায় দিন।"

তিলোত্তমা আবার কি ইসারা করিলেন, বিমলা উত্তর করিলেন।—"আমার সখী বলিতেছেন,—আপনি বিদায় লইতে পারেন, আমরা বিদায় দিতে পারি না।"

কুমার। "আমিই কি আপনার সখীকে বিদায় দিতে পারি?"

তিলোত্তমার ইঙ্গিতে বিমলা উত্তর করিলেন। "আপনি যে, বিদায় দিয়াছেন। —আর দিব না বলিলে চলিবে কেন?" কুমার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন। "আমি আপনার সখীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম।"

বিমলা। "আমার সখী, তাঁহার পরাজিত অরীকে বন্দী না করিয়া সম্প্রতি মুক্তিদান করিলেন।" কুমার। "সম্প্রতি!—তবে কি সমায়ান্তরে আবার বন্দী করিতে চান।" বিমলা। "যদি আবার বিদায় দিবার অপরাধে ধরা পড়েন।"

কুমার। "ছাড়িয়া দিলে আবার সে চোর ধরা দিবে কেন?"

বিমলা। "যাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইল না, তিনি পলাইবেন কেন?"

এইরূপ রসালাপের পর, অবশেষে উভয়পক্ষ উভয়পক্ষকে বিদায় দিলেন। এবং তাঁহারা তখন আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

৩ ❋ ইনিই পরমহংস। ❋ ৩

সে কালের জীবিত দেবতার নাম পরমহংস অভিরামস্বামী। বীরেন্দ্রসিংহের পুরবাসী ও গড়মান্দারণের সকলেই এই মহাপ্রভুকে ভক্তি করিতেন। এবং বঙ্গদেশের অনেক অনেক স্থলে এই দেবতার সম্মান ছিল। ইনি ইঁহার যৌবনকাল হইতেই মহিলামণ্ডলী ও বিধুরা বিধবাদিগের মধ্যে স্বামীত্ব করিয়া আসিতেছেন। ইনি এখনও একেবারে স্থবীরবৃদ্ধ হন নাই, দেবতা সাজিয়া দেবীদের সহিত লীলা

করিবার বয়স এখনও আছে। (এই লম্পট শ্রেষ্ঠকে দেবতার সম্মান দিয়া, বুদ্ধি— বীর নভেল ঠাকুর কি সমগ্র হিন্দুজাতিকে নিন্দিত করিয়া দেখান নাই ?)

পরমহংস অভিরামস্বামী, একদিন তাঁহার পর্ণকুটীরে বসিয়া আছেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর। প্রখরভাস্করকরে সম্মুখের প্রান্তর জ্বলিতেছিল; অনলমুখী উত্তপ্ত অনিল অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। এমন সময়ে আশমানী নাম্নী এক প্রৌঢ়া যবনী এক দীর্ঘাকৃতি একহারা পুরুষের কাঁচা ধরিয়া, পরমহংসের নিকট আসিলেন। সে ব্যক্তি পশ্চাৎপদে হাঁটিয়া হাঁটিয়া, সমস্ত পথ, এক অপরূপ 'ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে আসিয়া, পরমহংসের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত রাঁধা অড়হরের ডাল গড়াইতেছিল, কয়েকটি ছেলে এবং দুইটা কুকুরও সেই ডালমাথা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। পরমহংস এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন। "একি এ, গজপতি ?" গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ-ঠাকুরের ল্যাজটা তখন আসমানীর হাতে। তিনি অভিরামস্বামীর দিকে পশ্চাৎ করিয়াই বলিলেন। "এই আসমানীর কাজ !"

আসমানী তাহার লেজ ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন। "ঠাকুর! ইনি আহার করিতে করিতে কথা কহিয়াছিলেন। আমার মাথাভাত খাইয়াছিলেন। তাই আমি দালের হাঁড়ীটা ওঁর মাথায় ভাঙ্গিয়াছি। তা' আর তো ওঁর জাত টাত নাই। যদি না থাকে বলুন, আমি ওঁকে আমার জাতে তুলিয়া লই।"

দিগ্‌গজ স্বীয় সাবেক স্বরে কাঁদিয়া বলিলেন। "ওরে, আমার আবার জাত আছে। আস্ত ডালের হাঁড়ি মাথায় ভাঙ্গিলি, জাতটাকে যে তার সঙ্গে চূর্ণ করিয়া দিলি। তুই যদি তোর জাতিতে না নিস্, আমি আপনি মস্‌জিদে গিয়া জাত বদলাই করিয়া আসিব।"

পরমহংস বলিলেন। "তুমি কাঁদিও না, তোমার জাত নষ্ট হয় নাই। তুমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর আবার জাত কি ? বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকে পুরুষের জাত মারিতে পারে না। তুমি যাও স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া মনে মনে ভাবিলেন। 'কত ডোম, চামার, ইতর, মেথর পার করিলাম, জাতের একটা কোণও খসিল না। বরং তাহাতে আমার সম্মানসাগরে জুয়ার দেখা দিল।'

দিগ্‌গজ ঠাকুর আপন গাল আপনি চড়াইয়া উদারা স্বরে কাঁদিয়া বলিলেন। "হায়, সর্ব্বনাশ, এখন আমার উপায় কি ? এত করেও তো জাত গেলনা, লাভের

মধ্যে ডাল হাঁড়িটা নষ্ট হইল। আমি শেষে সবকুল হারাইলাম! তা 'ঠাকুর আসমানীর সঙ্গে আমার নেকা পড়াইয়া দিন।" পরমহংস। "তুমি ব্রাহ্মণ আর আসমানী মুসলমান, এরূপ বিবাহে তোমার জাত নষ্ট হইবে।"

দিগ্‌গজ। "এই তো বলিলেন স্ত্রীলোকে পুরুষের জাত মারিতে পারে না, আবার আমি তায় সন্ন্যাসী।—জাতটা, বাক্যস্রোতের কুটা নাকি। যে দিকে বাক্য স্রোত, কুটাও সে দিকে।" আসমানী বলিলেন। "জাত টা কিনা 'ধুকি পিটে' ছুলেই ভাঙ্গিবে।" দিগ্‌গজ আরও কাঁদিতে লাগিলেন। "আসমানীর মাখাভাত আমাকে মিষ্ট লাগে, আমি ওঁকে বিয়ে করিব।"

পরমহংস জ্বালাতন হইয়া বলিলেন। "তবে যাও আসমানী ওকে স্নান করাইয়া আন।" আসমানী তাহার ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। ছোঁড়াগুলাও 'হো হো' করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। (ঠাকুর মনে করেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকল স্বভাবতঃ ভীরু, চরিত্র হীন ও সমাজের অনিষ্টকারক, পুস্তক মধ্যে এই রূপ চরিত্র আঁকিয়া প্রকৃত হিন্দু সমাজের সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা মনোমালিন্য ঘটাইয়া দিয়াছেন। বিবেচনা করি ঠাকুর সুপ্তসিংহের গভীর গর্জ্জন অনেক দিন শুনিতে পান নাই। সমস্ত হিন্দু জাতিকে, কে, এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে? উন্মার্গগামী কবিপ্রবর সে চিন্তা করিতে পারেন কি?)

জলের ঘাটে আসিয়া দিগ্‌গজ ঠাকুর স্নান করিলেন। তখন আসমানী তাহাকে পরামর্শ দিলেন। "তুমি মস্‌জিদে গিয়া মুসলমান হইয়া আইস।" তিনি অমনি পুকুর ঘাট হইতে মস্‌জিদ পানে মুখ করিলেন। আসমানি গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু ছেলেদেরকে, কি শিখাইয়া দিলেন, তাহারা দিগ্‌গজের পশ্চাৎ লইল। দিগগজ মস্‌জিদে যাইয়া মুসলমান হইবার পর, বাহিরে আসিলে, ছেলেরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া কিছুতেই গ্রামে প্রবেশ করিতে দিল না। আসমানী অভিরামস্বামীর নিকট আসিয়া সকল কথা বিবৃত করিলে, তিনি বলিলেন। "ব্যাটা গেছে—আপদ গেছে। তা' আসমানী! তুমি আইশাশের কোন ঠিকানা করিতে পারিলে না কি?"

আসমানী অমনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন। "আর আইশাশকে পাইব! ঠাকুর, তাকে ছেলেধরাতেই নিয়ে গেছে। আহা, আমি তাকে কখন চোখছাড়া করিনি। ঐ আইশাশের মায়াই আমাকে দিল্লী হতে এখানে এনেছে। যেখানে গিয়াছি তাকেও সঙ্গে লইয়াছি। পুদির অসুখ বলিয়া সেদিন সে একাই

পাঠশালায় গেল।—মা আমার পাঠশালা থেকে নাচতে নাচতে বাড়ী আস্‌ত। সেই গেল, আর আসিল না, আর আমার গলা ধরিল না।" এই বলিয়া আসমানী কাঁদিতে লাগিল। অভিরামস্বামী তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন। "আর কাঁদিও না। আমি তোমাকে আর একটি মেয়ে দিব।" আসমানী। "না ঠাকুর, আর পুত্রকন্যা পালিব না।" এই বলিয়া সজল নয়নে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বিমলা সুন্দরী একদিন, অভিরামস্বামীর সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বসিয়াছিলেন। পরমহংস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "মা, তুমি যে মানসে শৈলেশ্বর দর্শনে গমন করিয়াছিলে, সে শুভমানসপূর্ণ হইল কি? তোমাদের সকলকেই পার করিয়াছি। কেবল তিলোত্তমাকে পার করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই।"

ফুল্লমুখী বিমলা বলিলেন। "বোধ করি, তিলোত্তমা, কুমারের অন্তঃকরণ অধিকার করিতে পারিয়াছে।"

অভি। "এদিকে আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ তো?"

বিমলা। "করিয়াছি! তিনি দুই সপ্তাহ পর আসিবেন, বলিয়াছেন।"

অভিরাম। "যে দিন আসিবেন; অমনি তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া, তিলোত্তমা ও তাঁহার জন্য, এক শয্যায় বাসর সাজাইয়া দিতে ভুলিও না।"

বিমলা। "বিবাহের আগে বাসর সাজানটা ভাল হইবে কি?

অভিরাম। "বিবাহের আগে বাসর না সাজাইলে, তিলোত্তমার মত কুলবতী বিকাইবে কেন?—তোমরা জানিবে কি, কত কৌশলে তবে, তোমাদের মত মেকি মুদ্রা চালাইতে পারিয়াছি।—কত ফন্দী খেলাইয়া তবে বীরেন্দ্রকে ফাঁদে ফেলিয়াছি, তবে তিনি তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।—তুমি যাও, তিলোত্তমাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও।" বিমলা অমনি পিতৃপদে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিমলা যাইবার পূর্ব্ব হইতে এক বিধবা যুবতী ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, কোন এক মানস লইয়া পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। বিমলা চলিয়া গেলে, অভিরামস্বামী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "আমি তোমার জন্য আজিও কিছু করিতে পারি নাই।—তপস্যাবলে সন্তান জন্মান এক তো বড় কঠিন কাজ; তারপর দিন দিন ক্ষমতারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে, অধিক রাত জাগিতেও পারিনা, অধিক তপও করিতে পারি না।—তুমি, কিছুদিন অপেক্ষা কর, একটি ছেলে হ'ক মেয়ে হ'ক তোমাকে দিব।"

বিধবা সুন্দরী, সকাতরে নিবেদন করিলেন। "ঠাকুর, আমার তিনকুলে কেউ নাই! যা'হক একটা ছেলে মেয়ে পাইলে, মন ভুলাইতে পারি। আপনি ছেলে মেয়ে দিয়া, কত অবলার শূন্যকোল উজ্জ্বল করিলেন; আর অভাগী আমার কথা-টাই মনে থাকে না! আপনার তপের সন্তানগুলি বেশ সুন্দর হয়, তাই আপনার নিকট আসিয়া কাঁদি! নচেৎ আরও কত সন্ন্যাসী আছেন।—তা' ঠাকুর, আমি কবে আসিব বলিয়া দিন। আমাকে একটি 'সেয়ানা সন্তান দিবেন।"

অভিরাম। "সেয়ানা সন্তান আর কোথা পাইব! দুইটী নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু আছে, তারই একটী তোমাকে দিব।" বিধবা। "এখনি একটি দেন না কেন?"

অভিরাম। "নিশার গভীরে অপ্সরীরা আসিয়া, তাহাদের স্তন্যপান করাইয়া যান। একটু সেয়ানা হউক একটিকে লইয়া যাইও।"

বিধবা। "সে ছেলেরা কোথা! একবার দেখান না ঠাকুর!"

অভিরাম। "কুঁড়ের ভিতর গিয়া দেখ গে।" বিধবা সভয়ে বলিলেন। "আমার সঙ্গে যে কেউ নাই। একা যাইতে গা 'চম্‌চম্‌' করে।"

অভিরাম। "আমি যাইতেছি চল! পবিত্র পত্রকুঠীরমধ্যে পাপ নাই, দোষ নাই।" বিধবা। "ঠাকুর! আমি বার থেকেই দেখছি। ঐ যে, বেশ ছেলে গো! যেন দেব সন্তানেরা খেলা করিতেছে।—তা' ঠাকুর আমাকে এখনি একটি দেন।—আমাকে ঐ দক্ষিণ পাশের ছেলেটি দেন।" অভিরাম। "তোমার দেখি,—ধান নাই চা'ল নাই, আড়িটি ডাগর। এক তো তপ করিবার সময় সঙ্গে থাক্‌বে না, একটু সিদ্ধি বাটবে না, আবার ছেলেটি চাও ভাল।"

"তাই করিব, আজ রাত্রে আসিব।" এই বলিয়া বিধবা চলিয়া গেলেন।

বিধবা প্রস্থান করিবার পর, তিলোত্তমা আসিয়া অভিরামস্বামীর নিকট বসিলেন। "দাদা আমাকে ডেকেছেন কেন?" অভিরাম হাসিয়া বলিলেন। "তুই নাকি আমাকে বিবাহ করিবি না, আবার বর খুঁজিয়া বেড়াইতেছিস্‌?"

তিলোত্তমা। "তোমাকে কে কবে বিবাহ করিয়াছে, যে আমি করিব?"

অভিরাম। "বিবাহ করে নাই, তবে তোরা জন্মিলি কি করে?"

তিলোত্তমা। "সে তো আপনার তপস্যা বলে।"

অভিরাম। "নৈলে অত রূপ পাইবি কেন? তা আমাকে বিয়ে কর্ব্বি নে?"

তিলোত্তমা। "আপনি যদি এতই বিয়ে পাগলা বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন; তবে শৈলেশ্বর দর্শনে পাঠাইলেন কেন?"

অভিরাম। "তাতে আর ক্ষতি কি হইয়াছে? সেখানে গিয়া, শীকার করিতে তো পার নাই।—সে তো আর আমার মত বুড়া মৃগ নহে, যে একবানেই ধরাশায়ী করবে।—সে জগৎসিংহ।

তিলোত্তমা। "আয়ী যখন বান মেরেছিলেন তখন তো আপনি বুড়ামৃগ ছিলেন না, তাঁর ক'বানে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, দাদা!

অভিরাম। "সে এক বান রে—একটা বান, তাও পুরা নয়। তোমারা রূপের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছ মাত্র। সেরূপ নয়নবান পাইলে কই? তবে বুড়াটাকে শীকার করবার জন্য যথেষ্ট বটে।" তিলোত্তমা। "তাই বই কি! দিদি বই আপনার চোখে আর খেলওয়াড় কে?—তা' দিদি স্বপ্নে টপ্নে দেখা দেন কি?

এমন সময়ে কুটীর মধ্যে ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। অভিরামস্বামী বলিলেন।—"যদি দেখা দিবে না, তবে ছেলে কাঁদে কার।" তিলোত্তমা। "আমি ভেবেছিলুম, ওরা আপনার তপের লব, কুশ।" অভিরাম। "তোমারাও কি আমার তপের ফল নও?" তা' যাও, ঐখানে বাটীতে দুধ আছে, ঝিনুক আছে। শিশুদের দুধ খাওয়াইয়া আইস! তিলোত্তমা শিশু সেবায় গেলেন। অভিরাম ভাবিলেন। "ছুঁড়িটা ঠিক শীকার করিয়াছে।" (ঠাকুরের এই দৃষ্টান্তে দেশে এত স্বামী বাড়িয়াছে যে, সকলেই অস্বামিক হইয়া গিয়াছে। এদেশে কেহ কাহার প্রভুত্ব স্বীকার করে না। পুত্র পিতাকে ও ছাত্র গুরুকে মানে না। দেশটা চুরি ডাকাতি, ভ্যাজাল পণ্য বলাৎকার প্রভৃতি অত্যাচারের বন্যায় ডুবিয়া যাইতেছে, যেন দেশে কেহই প্রভু নাই।)

৪ ✻ হংসহংসীর গলায় ফাঁসী। ✻ ৪

এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে লিখিত কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলাম। সে অংশে নভেল ঠাকুর তাঁহার অক্ষয় অভিরুচির কীর্ত্তি দেখাইয়া, পবিত্র কন্যা দুর্গেশনন্দিনীকে, তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে বাসরে ঠেলিয়াছেন। এবং এমন সুন্দর ভাব ও ভাষায় সেই বেশ্যা-নিকৃষ্ট-ব্যাপার বিবর্ণিত করিয়াছেন যে, রন্ধনের গুণে সেই মড়ার মাংস অনেকেরই রসনায়, সুখাদ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। আবার বিমলা, রহিমখাঁয়ের সহিত, এমন অধম ও অরুচ্য প্রকৃতির জাল প্রণয় ও ভাণের ভালবাসা দেখাইয়াছেন

যে, কোন ভদ্রমহিলা তাঁহার প্রাণান্তেও তদ্রূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। স্বীয় জাতি ও সতীত্ব ধর্ম্মের উপর, এইরূপ নিষ্ঠীবন বর্ষণ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে, কোন। গ্রন্থকারকেই দেখি নাই।

একদিন নবাব কৎলুখাঁ, তাঁহার বর্হিবাটীতে, পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার সেনাগণ মহোৎক্রোশ-প্রকাশী জয়ধ্বনিসহ নবাব সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সেনাদলের পরিচালকরূপে নবাবের উপযুক্ত পুত্র বীরপ্রবর ওসমানখাঁন ছিলেন।

ওসমান খাঁ তাঁহার অরি-বিনাশন শক্তিবলে, বীরেন্দ্রসিংহকে সপরিবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিয়াছেন। তাহার উপপত্নী বিমলা, এবং দুশ্চরিত্রা কন্যা তিলোত্তমাকে আনিয়া হাজির করিয়াছেন। আর এক শিবিকামধ্যে রণাহত জগৎসিংহকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন। হংসহংসী সকলেই বন্দী।

বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিয়া কৎলুখাঁ হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কুমার ওস্‌মানের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "কি কৌশলে এই হিন্দুকুল-নিষ্ঠীবন-বীরেন্দ্র সিংহ বন্দী হইল?"

ওসমান খাঁ, পিতৃপদে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন। "জগৎসিংহ এই বীরেন্দ্র সিংহের কন্যার উপপতি। এই বিমলা, সেই অবৈধ মিলনের কুটনী। এ দুষ্টা নিয়ত গভীর রাত্রে, কুমারকে সঙ্গে লইয়া গুপ্তদ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত। আমরা অনুসন্ধানে তাহা জানিতে পারিয়া গতরাত্রে উহাদের পশ্চাতাবলম্বন করি; অতঃপর, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একে একে সকলকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লই। পরিশেষে যখন, তিলোত্তমার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করি, তখন তথায় তিলোত্তমা এবং জগৎসিংহ, উভয়কে একত্র দেখিতে পাই। তিলোত্তমাকে রক্ষা করিবার জন্য জগৎসিংহ অস্ত্র ধারণ করেন; তাহাতে কুমার আমার অসিতে সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে শিবিকায় তুলিয়া আপনার নিকট আনিয়াছি।"

কৎলুখাঁ, মস্‌নদ হইতে উঠিয়া কুমার জগৎসিংহকে দেখিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করিয়া, ওস্‌মানের প্রতি আদেশ করিলেন। "ওস্‌মান! তুমি এই কুমারকে বর্হিবাটীর মধ্যে কোন একটি স্বতন্ত্র আবাসে রাখিয়া, অন্তঃপুরের দাসদাসী দিয়া ইহার সেবা শুশ্রূষা করাও! এমন কি তুমি নিজেও ইহার সেবা করিতে অবহেলা বা অপমান মনে করিও না। কুমারকে

বাঁচাইতে পারিলে, পরিণামে আমাদের অনেক উপকার হইতে পারিবে। কুমারের মৃত্যু ঘটিলে, এই সমরানল চতুর্গুণ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবে। সেহেতু প্রাণপণে উহার শুশ্রূষা হওয়া একান্ত উচিত। আর এই চিরঅহঙ্কারী জন্তুবুদ্ধি বীরেন্দ্রকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখ। আর রমণীদ্বয় বেশ্যানিকৃষ্টা হইলেও কৃত্রিম কুলমহিলা। অন্তঃপুরের একপার্শ্বে উহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দাও।" এইরূপ আদেশ করিয়া, কৎলুখাঁ, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিমলা এবং তিলোত্তমাকে অন্তঃপুরমধ্যে স্থান দেওয়ায়, ওস্মানের অভিমত ছিল না; কিন্তু তিনি সুপুত্রের ন্যায় পিতার আদেশ সকল যথারীতি পালন করিলেন। বর্হিবাটীর উত্তর পশ্চিম ভাগে, রাজপথের দিকে পশ্চাৎ করিয়া একখানি ত্রিকক্ষবিশিষ্ট সুন্দর দেড়তালা হর্ম্ম্য, ছিল। ওস্মান খাঁ জগৎসিংহের জন্য সেই মনোহর দক্ষিণদ্বারী আবাসখানি নির্ব্বাচন করিলেন। সেই সুসজ্জিত কুটুম্বাবাসে, জগৎসিংহকে সযত্নে স্থান দিয়া, দাসদাসী ও ঔষধাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জগৎসিংহের যথারীতি চিকিৎসা ও সেবাযত্ন হইতে লাগিল। ওস্মানখাঁ তাঁহার অবসর সময়, জগৎসিংহের নিকট বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে, ওস্মান খাঁ, জগৎসিংহের নিকটে আসিয়া বসিলেন। এমন সময়ে, এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া, রসবতী রূপসী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লেখক বলিয়াছেন, এই লাবণ্যময়ীর রূপজ্যোতি ছাত ফুড়িয়া আকাশের চাঁদকে পর্য্যন্ত মলিন করিয়াছিল। আমরা তথাস্তু বলিলাম। ওস্মান খাঁ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "আয়েশা, তুমি এখানে কেন?" আয়েশা তাঁহার দাড়িম্ব-দানা বিকাশী মনোহর হাসি হাসিয়া বলিলেন। "আপনি এখানে আসিয়াছেন তাই।" ওস্মান। "তবে আমার নিকট বস! আর যখন আমাকে অন্য কোথাও না পাইবে, এইখানে আসিও।"

আয়েশা ওসমানের নিকট বসিলেন। এবং দুইজনে কথোপকথন করিতে করিতে সহসা আয়েশার নয়নদ্বয় রোগীর দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি সেই রুগ্ন মুখের দিকে আড়নয়নে চাহিতে লাগিলেন। রোগীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল। দাসীরা ঔষধ খাওয়াইতে পারিত না, রোগীর কস দিয়া গড়াইয়া পড়িত। তাহারা ঔষধ পাত্রে ঢালিয়া খাওয়াইতে হাত কাঁপাইতেছিল। আয়েশা ওস্মানকে বলিলেন। "অনুমতি করিলে আমি ঔষধ পান করাইয়া দিই।" ওস্মান অনুমতি দিলেন।

চতুরা আয়েসা, বাম হস্তে জগৎসিংহের মুখ উচ্চ করিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে তাঁহার অধরে ঔষধ ঢালিয়া দিলেন। এবং 'ঔষধ পান কর।' বলিয়া রোগীকে এমন ভাবে চমৎকৃত করিয়া দিলেন যে, রোগী ঢোকগিলিতে গিয়া ঔষধ গিলিয়া গেলেন। (এইরূপ কার্য্য হিন্দু মহিলারাই গৌরবের সহিত করিয়া থাকেন, সম্ভ্রান্ত মোসলেম কন্যারা কখনই করেন না। তবে যে এস্থলে করিল সে কথা আয়েশার জীবনী পাঠ করিলেই বুঝিবেন। ঠাকুর যেরূপে দেখাইয়াছেন। মোসলেম পর্দ্দা-প্রথা কখনই সেরূপ নয়।)

আয়শার কার্য্যপটুতা দেখিয়া, ওস্মান বলিলেন। "তুমি একবার একবার আসিয়া রোগীকে ঔষধ পান করাইয়া যাইও।" আয়েশা এই অনুমতি পাইয়া আপনাকে যেন সৌভাগ্যশালিনী মনে করিলেন। পরন্তু তিনি স্বীয় চিত্ত ঢালিয়া জগৎ-সিংহের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। (যে সকল অরুচ্য রুচিতে ঠাকুর হিন্দু-কুলবতীদের সাজাইয়াছেন এখানেও তিনি সেই রুচি মুসলমানদের জন্যও ব্যবস্থা করিলেন কেন, তাহা পরে বুঝিবেন।

এই সময়ে কৎলুখাঁও পীড়িত হইলেন। আয়েশা তখন দুটানায় পড়িয়া গেলেন। একদিন কৎলুখাঁর অবস্থা এমন ভীষণ হইয়া পড়িল যে, পুরবাসীরা তাঁহার জীবনের শেষ বিবেচনা করিয়া লন। শান্তস্বভাবা আয়েশা, তাঁহার মধুমিশ্রিত করপঙ্কজে আনার ভাঙ্গিয়া, এরূপ সুবাসিত ভাষায় 'পিতা পিতা' বলিয়া ডাকিয়া সেই আনাররস পান করাইয়া, সে যাত্রা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন যে, সকলেই তাঁহার সেবা প্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বিমলা আয়েশাকে মনে মনে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আয়েশা, তাঁহার চক্ষে এরূপ লাগিয়া গেল যে, অকারণে তিনি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতেন। কেবল আয়েশার মনস্তুষ্টির জন্য, বিমলাও প্রাণপনে কৎলুখাঁর সেবা করিয়াছিলেন। যখন আয়েশা কৎলুখাঁকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন তখন বিমলার মনে হইত,—"আমি যদি কৎলুখাঁর ভার্য্যা হইতাম, আয়েশা আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত।

৫ ✻ বীরেন্দ্রের বীরত্ব। ✻ ৫

করিলেন। একদিন তিনি বীরেন্দ্রসিংহের বিচার করিবার জন্য দরবার সাজাইয়া বসিলেন। নবাবের পীড়িতাবস্থায়, যে কারণেই হউক বিমলা তাঁহার সেবা ও যত্ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি বীরেন্দ্রের প্রতি দয়া করিতে মনে মনে স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন। (আমাদের নূতন ঠাকুর, বীরেন্দ্র সিংহের দর্প ও বীরত্বাদি এক অপরূপ কল্পনায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে অসি, বর্ষা ও চর্ম্মাবর্ম্মীর স্থলে ভকুয়া, চর্ম্মাস্ত্র ও জীর্ণ চর্ম্মরাশি দিয়া এক অপরূপ 'জুতা সেলাই' ভকত সাজাইয়া, দুর্গন্ধময় দর্প দেখাইয়াছেন।)

"কয়েক জন অস্ত্রপাণি প্রহরী বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিলেন। বীরেন্দ্রসিংহের মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভীতিচিহ্ন কিছুমাত্র নাই। (বধ্যভূমিতে তস্করও স্বল্পাধিক ভীতিচিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু জন্তু নিকৃষ্ট বীরেন্দ্রের তাহাও জন্মিল না, কেন? যাহার আবাসপানি, বেশ্যালয়স্বরূপ অধম তাহাকে মারিতে হয় না, আপনি গলায় দড়ি দিয়া মরে। সেই জন্যই বীরেন্দ্র স্বীয় প্রাণের মমতা করে নাই। নচেৎ বধ্যভূমিতে মরায় বীরত্ব কিসের?)

"কৎলু খাঁ বীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে?" বীরেন্দ্র। (কিসের?) ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন। "তোমার বিরুদ্ধে আমি কোন্ কর্ম্ম করিয়াছি, অগ্রে তাহা বল?" (ঠাকুর ভাবিয়াছেন এইরূপ উক্তিতে বীরত্ব প্রকাশ পায়। এইরূপ উক্তি যে তস্করী কবিদের মনোগত প্রতিহিংসা প্রকাশ করিয়া থাকে, ঠাকুর ততটুকুও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।)

একজন পারিষদ বীরেন্দ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন। "আপনি কি পাগল হইয়াছেন? আপনাতে কি সভ্যতা ও বিনীত ভাব নাই? আপনি অলীক অহঙ্কারে এমন উন্মত্ত কেন?" বীরেন্দ্র বলিলেন। "রাজদ্রোহী দস্যুর নিকট বীরেন্দ্র বিনীত হইবার নহে। দস্যুকে সেনা ও অর্থবল দিয়া বীরেন্দ্র সাহায্য করিতে পারে না।" (এই সঙ্গে বীরেন্দ্র আরও কয়েকটি দর্পের কথা বলিয়াছিলেন। ঠাকুর তাহা চর্চ্চা না করিয়া গোপন করিয়াছিলেন। আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি। বীরেন্দ্র আরও বলিলেন। "যাহার গৃহে তিলোত্তমার ন্যায় কন্যা এবং বিমলার ন্যায় পত্নী রহিয়াছে সে কি দস্যুপতি কৎলুকে ডরায়?—আমাকে কাটিয়া ফেল, জগৎসিংহকে শূলে দাও ক্ষতি নাই!—তিলোত্তমা ও বিমলা বাঁচিলে, সহস্র জগৎসিংহ ও সহস্র বীরেন্দ্র পলকের মধ্যে আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবে।—আমার মুণ্ডপাত করিয়া তো দেখ!"

দর্শকেরা দেখিলেন, বীরেন্দ্র আপন মস্তক আপনি ছেদন করাইতে বসিয়াছেন। বলিলেন। "বীরেন্দ্র! তুমি কি মা[illegible] কাটাইয়া বীরত্ব দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছ?")। আত্মসংযম পরায়ণ কৎলুখাঁ বলিলেন। "তুমি আমার অধিকারে বসতি করিয়া, মোগলের সহিত মিলিত হইলে কেন?" বীরেন্দ্র তাঁহার ভকত ভাষায় উত্তর করিলেন। "তোমার অধিকার কোথা?" (আমি যে ঈশ্বরের অধিকারে বাস করিতেছি। তোমাকে কখনও কর দিই নাই।)

"কৎলুখাঁ কুপিত হইয়া বলিলেন। "তোর জীবনের আশা ছিল। কিন্তু নিজ দর্পে নিজ বধের উদ্যোগ করিতেছিস্।" বেহায়া বীরেন্দ্র সগর্ব্বে হাস্য করিয়া উত্তর করিল। "যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই। যদি আমার পবিত্র কুলে কালী না দিতে, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিতাম।" (অর্থাৎ যদি তুমি আমার স্ত্রীকন্যাকে বন্দিনী করিয়া না রাখিতে, তাহা হইলে তাহারা আমাকে সৈন্যবল যোগাইতে পারিত। তাতে যদি তুমি আমাকে মারিয়াও ফেলিতে, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিতে পারিতাম। যখন তুমি আমার সৈন্যবলের পুঁজিটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছ, তখন তোমার ন্যায় দস্যু ও শত্রুর নিকট আমি দয়ার প্রত্যাশী হইতে পারি না।)

কৎলুখাঁ আর থাকিতে পারিলেন না, জনতার মধ্যেই বলিয়া ফেলিলেন। "তোমার স্ত্রীকন্যার ন্যায় জারজারা, তোমার সুচারুরুচির উপযুক্ত পবিত্র হইলেও আমার বাড়ীর মেথরের নিকটও তাহারা বেশ্যানুরূপ অপবিত্র। তথাপি আমি ভদ্র-লোকের সম্মান রাখিয়া তাহাদিগকে যত্নের সহিত অন্তঃপুরে রাখিয়াছি।" বীরেন্দ্র নীরবে রোদন করিলেন। কৎলুখাঁ বলিতে লাগিলেন। "বীরেন্দ্র, তোমার সময় নিকট, কিছু বাঞ্ছা থাকে কর।" বীরেন্দ্র। "কিছু না।—আমার বধকার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত কর। এই মাত্র বাঞ্ছা।" দর্শকবৃন্দ বলিতে লাগিলেন। "তা বই, তোমার গৌরব আর কিসে আছে? বীরের ন্যায় গলায় দড়ি দিবে ফাঁস কাটে ঝুলিবে, কলসী গলায় ডুবিবে। কেরোসিনে পুড়িয়া মরিবে আত্মহত্যাই তোমার জন্য বীরত্ব ও গৌরব। আর তোমার এই দৃষ্টান্তে হয় তো দেশেও এই গৌরব বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকিবে, আন্দামান গমনে সম্মান মনে করিবে।"

কৎলুখাঁ বলিলেন। "আর কিছু চাও না?" বীরেন্দ্র। "না, কিছু না।"

কৎলুখাঁ ভাবিলেন। "সন্তানমায়া একটি কুকুরেরও আছে। আমার ধর্ম্ম

ও রুচি মতে উঁহার স্ত্রীকন্যা বেশ্যানিকৃষ্টা হইলেও, উঁহার মতে তাহারা দেবীসদৃশা কুলোত্তমা-কামিনী হইতে পারে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন। "তোমার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না?" বীরেন্দ্র ভকত, আত্ম গৌরবে পূর্ণ হইয়া বলিলেন। "যদি আমার কন্যা তোমার গৃহে জীবিতা থাকে, তবে সাক্ষাৎ করিব না। যদি মরিয়া থাকে, লইয়া আইস, কোলে করিয়া মরিব।" (বঙ্কিম গ্রন্থের পাঠক বৃন্দ এতদূর বিকৃতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, বীরেন্দ্রের ঐ অবীরত্বকে প্রকৃত বীরত্ব বলিয়া মনে করেন এবং এই দৃষ্টান্তে স্বীয় অধম জীবনীকে উত্তম বলিয়া ভাবেন। এইরূপ শুনিয়া রঙ্গমঞ্চের দর্শকবৃন্দ আনন্দে দিশাহারা হইয়া হাততালি দিয়া বলিতে থাকেন। "ধন্য তুমি বীরশ্রেষ্ঠ বীরেন্দ্র, হিন্দুকুল গৌরব, দাম্ভিক। (ধন্য তুমি দ্বি-জারজাপতি) হিন্দুকুল জ্যোতি, তুমিই ধন্য। জ্ঞানী দর্শকেরা ঐ মূর্খ দর্শকদিগের ঐরূপ কুৎসিত আনন্দ ও রুচি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্তিমিত নয়নে চাহিয়া থাকেন।)

সেই শমনদূষ্ট বীরেন্দ্রসিংহের সম্মুখে প্রকাশ করা অন্যায় বিবেচনা করিয়াও কৎলুখাঁ বলিলেন। "তোমার পবিত্র পত্নী কন্যারা তোমার ন্যায় নীচ নরাধমের মৃত্যুতে অনুমৃতা হইবে, অথবা তাহারা মুসলমান গৃহে বাস করিতেছে বলিয়া আপনা-দিগকে কলঙ্কিনী মনে করিবে, সেরূপ গাঁজার খেয়াল তোমার মত জারজাপতির মস্তিষ্কেই উদয় হওয়া সম্ভব। তোমার দুর্গেশনন্দিনীর যে, অনেক দুর্গে অধিষ্ঠিতা হইতে বাকি। এবং তোমার বিমলার ফুলঝারিতে যে, এখনও অনেক বরমাল্য অস্পর্শ গ্রথিত রহিয়াছে, তাহা তোমার উদ্ভ্রান্ত বুদ্ধি বুঝিবে কি?"

নবাবের ইঙ্গিত পাইয়া, রক্ষিবৃন্দ, বীরেন্দ্রসিংহকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। সে দিকে বিমলা, অভিরামস্বামীকে সঙ্গে লইয়া, বীরেন্দ্রের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এবং অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া তাহার চরণে প্রণাম করিলেন।

(বিমলা এই বধ্যভূমিতে কেন?—যাহারা হারামী বা জারজাদের লীলা বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করিবে, 'স্বামীর ভালবাসা বিমলাকে এখানে আনিয়াছে।' কিন্তু কে বলিতে পারে যে, বিমলার হৃদয়ে যতকিছু স্নেহমমতা ও ভালবাসা আছে, সে সমুদায় এখন আয়েশার জন্য। তিনি কিসে কৎলুখাঁর পত্নী হইবেন এবং আয়েশা তাঁহাকে 'মা' বলিবেন, এই খেয়ালে আছেন। পাছে, বীরেন্দ্রসিংহের উপপত্নী বলিয়া, কৎলুখাঁয়ের নিকট পরিচিতা হইয়া পড়েন, ও সেই কারণে কৎলুখাঁ তাঁহাকে

গ্রহণ না করেন; সেইজন্য তিনি আজ জগৎ সমীপে বীরেন্দ্রসিংহকে স্বামী বলিয়া, একটা সার্টিফিকেট হাসিল করিতে এই বধ্যভূমিতে বীরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিসন্ধি।

(নভেল ঠাকুর এখানে অবাধে মিথ্যা বলিয়াছেন। বিমলা কোথায় কৎলু-পত্নী হইবার মানসে মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন; আর ঠাকুর কোথায় তাঁহাকে কৎলু-পত্নী বলিয়া দেখাইতেছেন। এবং আয়েশাকে কৎলুকন্যা ও ওসমানকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া, এক অদ্ভুত শান্তিভাঁড়ের ভাঁড়ামী আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিহাসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া, এরূপ অসার গ্রন্থ লিখিয়া যাঁহারা যশস্বী হইতে চান; তাঁহারা পরিশেষে অপযশের পয়োনালীতে পড়িয়া সং সাজেন।)

বিমলা বীরেন্দ্রের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন। "স্বামী, প্রভু, প্রাণেশ্বর—" অমনি বীরেন্দ্র বলিলেন। "আমি তোমার স্বামী নহি। আমার সম্মুখ হইতে যাও।" (তিনি মৃত্যুকালে, উপপত্নীর মুখ দেখিতে ঘৃণা করিলেন নাকি?)

বিমলা, (সার্টিফিকেট না লইয়া ছাড়িবার বান্দা নহে) আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। "আজ আমি জগৎসমীপে বলিব।—কে নিবারণ করিবে (আমি আর তোমার বাধ্য নই।) স্বামী! কণ্ঠরত্ন! কোথা যাও, আমাদের কোথা রাখিয়া যাও। (বিমলা সার্টিফিকেট পাইলেন।) বীরেন্দ্রসিংহের চক্ষে চল আসিল। বিমলার হাত ধরিয়া বলিলেন। "এ সময়ে কেন আমায় রোদন করাও।" বিমলাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিলে, তিনিও তাঁহার মন রাখিয়া কতিপয় কথা বলিলেন। তারপর যখন বীরেন্দ্রের মস্তক ছেদিত হইয়া ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইল। বিমলা তাহা নিরশ্রুনয়নে অবলোকন করিয়া, তথা হইতে কৎলুখাঁর উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

৬ ❋ আয়েশার অভিরুচি। ❋ ৬

আয়েশার অপার যত্ন পরিশ্রমের ফলে, জগৎসিংহ ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিলেন। বোধ হইল যেন, মিষ্টভাবিনী আয়েশার রূপরাশি ও মধুহাসি সমূহ, জগৎসিংহের জন্য মহাব্যাধিবিনাশন মহৌষধি হইয়া গেল। তিনি দিন দিন আরোগ্যলাভ করিয়া অচিরাৎ ব্যাধিশূন্য হইয়া গেলেন। আয়েশার রূপ ও গুণরাশি যে, কেবল তাঁহার পীড়া তাড়াইয়াছিল তাহা নহে। কুমারের স্মৃতিপটে, তিলোত্তমার মনোহর

ছবিখানি, মধুমাখা হাসি, ও প্রাণভরা প্রণয়, যাহা অনুক্ষণ জাগিতেছিল, তাহাও আর তাঁহার সেই স্মৃতিপটে নাই। এখন সেই পট আয়েশার অধিকারে আসিয়া গিয়াছে। অন্যপক্ষে আয়েশারও হৃদয়পটে কুমার জগৎসিংহের মোহনমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনিও তখন জগন্ময় কেবল জগৎসিংহকেই দেখিতেছিলেন।

একদিন প্রদোষকালে এই যুগলমূর্ত্তি একত্র বসিয়া আছেন। কুমার জগৎসিংহ আয়েশার সেই ইন্দু বিনিন্দিত মনোহর বদনপানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন; এবং তাঁহার সেই প্রসূনবনবৎ সুধাবিতরী বাক্যাবলী শুনিয়া, স্বীয় শ্রবণেন্দ্রিয়কে অযুত আনন্দের ভোগদান করিতেছেন; এবং তাঁহার সেই ইন্দিবর-নিন্দি-নীল নয়ন দ্বয়ের পরিবর্ত্তনশীল কিরণকান্তি নিরীক্ষণ করিতেছেন। আয়েশার আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি তদীয় পৃষ্ঠদেশে যেন তরঙ্গ বিছাইয়া রাখিয়াছে। সেই কেশরূপী তটিনীর দুইটি শাখাপ্রবাহ তাঁহার গোলাপী গালের প্রতিপার্শ্বের কিয়দংশ ঢাকিয়া, গিরিগহ্বরে গমন করিয়াছে। আয়েশার নাসিকা, ভ্রূযুগল, কর্ণদ্বয়, কর্ণেন্দু, কণ্ঠমালা ইত্যাদির শোভা দর্শন করিয়া জগৎসিংহ ক্রমশঃই, অবশ অজ্ঞান, অচল, ও প্রস্তরবৎ হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার রুগ্ন হৃদয়োদ্যানে বসন্ত বাতাস প্রবাহিত হইতেছে ও অবিশ্রান্ত আশাপুষ্প ফুটিতেছে। পক্ষান্তরে আয়েশাও, স্বীয় প্রাণে তুল্য-সুখানুভব করিতেছিলেন।

জগৎসিংহ কতক্ষণ ধরিয়া সেই লাবণ্যময়ীর মুখাবলোকন করিয়া, এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন। "আয়েশা, তুমিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। আমি যে কি করিয়া তোমার সেই ঋণ পরিশোধ করিব, তাহা জানি না।"

আয়েশা অবনত মস্তক হইয়া বলিলেন। "আমি আপনার কোনই উপকার করিতে পারি নাই। তবে যতটুকু ক্লেশ দিয়াছি তাহা যদি নিজগুণে ক্লেশ বিবেচনা না করেন, তাহাই আমার জন্য যথেষ্ট সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। আমি আপনার সেবার যোগ্য না হইয়াও সেবা করিয়াছি, ইহা ধৃষ্টতা হইলেও আমার পক্ষে গৌরবোদ্দীপক কার্য্য বটে। আপনি যদি এই অসভ্য বালিকার কর্কশ কার্য্যকলাপে অসন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, তাতেই আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিতে পারি।

আয়েশার এই মধুমিশ্রিত বাক্যরসে, জগৎসিংহের মনপ্রাণ আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি আয়েশার করকমল ধারণ করিয়া বলিলেন। "মনোমোহিনী আয়েশা! আমি যে তোমার এই ধৃষ্টতা, ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। তোমার উপর আমার এমন

রাগ জন্মাইয়াছে যে, আমার চর্ম্ম খুলিয়া তোমার পাদুকা প্রস্তুত করিয়া দিলেও আমার সে রাগের শমতা হইবে না।"

আয়েশা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন। "আয়েশা, পাদুকা পরিবারও উপযুক্ত নয়; পাদুকা প্রহার খাইবারও উপযুক্ত নয়। সূর্য্যদেবের ন্যায়, আয়েশা আপন উত্তাপে আপনি গলিয়া আছে।" জগৎসিংহ বিরস বদনে বলিলেন। "আয়েশা, সত্যসত্যই তুমি আমাকে নিরাময় করিয়া ভাল কর নাই। লোকে বলে আমি আরোগ্যলাভ করিয়াছি; কিন্তু আমার যন্ত্রণা বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা আমিই জানিতেছি। আমার প্রতি লোমকূপে অগ্নি জ্বলিতেছে, প্রতি মাংসপেশী পুড়িয়া যাইতেছে, অস্থিমজ্জাদি অলক্ষ্যানলে সিদ্ধ হইতেছে। আয়েশা, কেন আমি তোমাকে দেখিলাম। চিরকাল যন্ত্রণাভোগ করিবার জন্য, কেন তোমাকে দেখিলাম।"

আয়েশার নয়নযুগল বারিপূর্ণ হইল, তিনি রুমালে নয়ন মোচন করিয়া বলিলেন। "যুবরাজ! আমিই শেষে আপনার যন্ত্রণার কারণ হইলাম! আমি কেন আপনাকে দেখা দিলাম, কেন দেখিলাম; কেন আপনার যন্ত্রণার কারণ হইলাম; কেন পুড়িলাম আর পোড়াইলাম। এই বলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ বদনে রোদন করিতে লাগিলেন।

জগৎসিংহ যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া, আয়েশার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন। "ইচ্ছা করিলে সুখের কারণ হইতে পারেন না কি?" আয়েশা। "আমরা তো আপনাদের মত জাতিভেদ সংস্কার রাখি না। তবে ওরূপ প্রশ্ন আমায় কেন?"

জগৎসিংহ। "আমরাও ঐ সকল কুসংস্কারের বশীভূত নহি। মুসলমানের সহিত, আমাদের পুত্রকন্যার আদান প্রদান, বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমার পিতা, কুমার সেলিমের শ্যালক হন, তাহা কি তুমি শোন নাই?"

আয়েশা নয়নে রুমাল চাপিয়া বলিলেন। "যোধাবাই বেগম ভাটার স্রোতে নামিয়াছিলেন; আমি জুয়ার ঠেলিয়া উঠিতে পারিব কেন? আমার মন্দ ভাগ্য কেহই ভাল করিতে পারিবে না।" বলিতে বলিতে আয়েশার বাক্যরোধ হইল। তিনি আর বলিতে না পারিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জগৎসিংহ তাঁহার মুখখানি ধরিয়া বলিতে লাগিলেন। "কেন আয়েশা, তুমি কেন কাঁদিবে। আমার দিকে চাহিয়া দেখ, তুমি কাঁদিও না।"

বর্ষা প্রপীড়িতা অধীরা তটিনীর তটভাগের কিয়দংশ যেমন খস ভাঙ্গিয়া নদী-

গর্ভে 'ঝুপ করিয়া' খসিয়া পড়ে, সেইরূপ. প্রেমাবশে, বিবশা আয়েশা, যেন আপনাকে আপনি খস ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেলেন। কোথায় পড়িলেন তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না ; আমরা দেখিলাম, কুমার জগৎসিংহের সুপ্রশান্ত হৃদয়ের উপর। যুবরাজ তাঁহার শুশ্রূষার দিকে অগ্রসর না হইয়া বাহুবেষ্টনে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন ; এবং সেই প্রত্যুষ-প্রস্ফুটিত শিশির বিধৌত গোলাপপর্ণ-প্রায় আরক্ত অধর যুগলের উপর স্বীয় পদ্মকুসুমগন্ধ অধরদ্বয় স্থাপন করিয়া যুগলমূর্ত্তি এক করিয়া, চেতন বিহীনা আয়েশার সহিত চেতনবিহীন হইয়া রহিলেন।

পাঠক ! চলুন, এখানে দাঁড়াইয়া থাকা অনুচিত। মুসলমানকুলে কালি দিয়া জগৎসিংহ তাঁহার চিররুচ্য অবৈধ বাসর নির্ম্মান করিতেছেন।

৭ * ঠাকুরের পাণ্ডিত্য। * ৭

পরদিবস অপরাহ্ণে ওসমান্খাঁ এবং জগৎসিংহ, কুটুম্বাবাসের বাতায়ন-পথে মুখ রাখিয়া রাজপথের উপর এক অভূতপূর্ব্ব জনতা দর্শন করিতেছিলেন। জনতার মধ্যে গজপতি বিদ্যাদিগ্গজ মাথায় টুপি পরিয়া, জগৎসিংহকে, তিলোত্তমার কুলচী অবগত করাইবার মানসে একটি গান করিতেছিলেন :—

আমার বাপ ছিল সাপুড়ে।* ঝাপান দেখতে গিয়ে আমার মাকে আনে কেড়ে। মেসো, পিসে, ডোম্‌ডোগ্‌লা ভগ্নীপতি নেড়ে।* আমিই কেবল খাঁটি বামন বাবার বাবা উড়ে।* আয়ী ছিল মড়াখাকী বেড়াত ভাগাড়ে।

যে সময়ে জগৎসিংহ, তিলোত্তমার নিকট গোপনে যাতায়াত করিতেন, সেই সময়ে তিনি বিদ্যাদিগ্গজকে প্রায়ই দেখিতে পাইতেন। আজ তাহাকে মুসলমান বেশে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, সেই জন্য ওস্মানখাঁকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। (তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের অবৈধ মিলনটা যে অনেক দিন ধরিয়া হইয়াছিল, নভেল ঠাকুর তাহা গোপন করিলেও এইস্থলে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে।—ঠাকুরের কি গম্ভীর বুদ্ধি !)

মুসলমান সম্প্রদায়কে বাঙ্গালা ভাষায় অজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্য নভেল ঠাকুর, এই পরিচ্ছেদটি লিখিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানকে অজ্ঞ প্রমাণ করা দূরে থাক, ঠাকুর আপনাকে আপনি অজ্ঞ প্রমাণ করিয়াছেন।

'গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ' নামটি, সত্যসত্যই মুসলমানদের জন্য কঠিন নাম। ওস্মানখাঁ, জগৎসিংহকে বলিলেন। "উহার নাম আমার মনে আসিতেছে না ভাল।— তোমরা এলেমকে কি বল?" জগৎসিংহ বলিলেন। "এলেমকে আমরা 'বিদ্যা' বলি। ওস্মান্ তথাপি ঐ নাম স্মরণ করিতে পারিলেন না, আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। "তোমারা হাতীকে' কি বল?" জগৎসিংহ বলিলেন। "করী, মাতঙ্গ, পেচীল, গজ ইত্যাদি।" ওস্মানের মনে পড়িল, তিনি বলিলেন উহার নাম গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ।" (পাঠক বুঝিতে পারিলেন কি, নভেল ঠাকুর এবং ওস্মানখাঁ, এই দুইজনের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় মূর্খ কে?—ঠাকুরকে দেখি, শিশুর মত দোয়াত উলটাইয়া গালে কালি মাখিতে খুব মজবুত।

ঠাকুরের কথাতেই প্রমাণ পায় যে ওস্মানখাঁ বঙ্গসাহিত্যে, ঠাকুরের অপেক্ষাও অধিক বুৎপত্তি রাখিতেন। তিনি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামটির এতদূর সন্ধিবিচ্ছেদ ও সূক্ষ্মতত্ত্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন যে 'এলেম এবং হাতী' শব্দ উহার নামের মধ্যে আছে, তাহা তিনি অনুশীলন করিতে পারিয়াছিলেন। পরন্তু ওস্মানের পক্ষে সে নামটি ভুলিয়া যাওয়া; ঠাকুরের ন্যায় স্থূল কল্পনাতে উদয় হওয়াই সম্ভব। আবার যিনি গজকে হাতীর সহিত এবং বিদ্যাকে এলেমের সহিত অনুবাদ করিতে পারেন তিনি, কখনই ঠাকুরের মত মূর্খ হইতে পারেন না। ঠাকুর গুটিপোকার মত আপন লালায় আপনি বদ্ধ হইবার, বড় ফন্দীবাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঠাকুরের সমুদায় পুস্তকগুলির সমালোচনা, এক উদাহরণে করিতে হইলে; তাহা এইরূপে করিতে হইবে:—

(হিন্দুকাননে কুলের গাছ, তার উপরে গুটিপোকারূপে ঠাকুরের জন্ম। ঠাকুর কুলের গাছ মুড়াইয়া পাতা খান, আর তলা ভরিয়া গোলমরিচ ছড়ান। কুলের দফায় রফা করিয়া অবশেষে ঠাকুর আপন লালে আপনি বাঁধা পড়েন। সেই ডিম্বাকার কারাবাসে প্রবেশ করিয়া, কিরূপ সুখদুঃখে থাকেন তাহা জানি না। তবে তাঁহার স্বর্ণফোঁটাবিশিষ্ট হরিত হীরাপ্রভ বর্ণরাশি বিলীন হইয়া সমস্ত শরীরখানি এক কাল, কুৎসিত, জলিয়া কয়লাবৎ নিৰ্জ্জীব পদার্থের ন্যায় হইয়া পড়ে। মুক্তিলাভের দিন ঠাকুর সেই গুটি কাটিয়া, সে কুল ত্যাগ করিয়া পরকুলে পলায়ন করেন। আমরা আর তাঁহার রেসমের খেই খুঁজিয়া পাই না।)

ওস্মান খাঁয়ের সঙ্গে জগৎসিংহ পথের ধারে আসিয়া, বিদ্যাদিগ্‌গজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন।—"আমাকে ধরিয়া মুসলমান করিয়াছে।

অভিরামস্বামী পলায়ন করিয়াছেন। বীরেন্দ্রসিংহকে কতল করিয়াছে। তিলোত্তমা এবং বিমলা এখন কৎলুখাঁর উপপত্নী হইয়া, অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন।" এই বলিয়া আবার গান ধরিলেন।—'আমার বাপ ছিল সাপুড়ে।'—

(ঠাকুর এইখানে আবার তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় বুদ্ধির আলো খুলিয়া দেখাইতেছেন যে, বীরেন্দ্রসিংহ ও তাঁহার পত্নীকন্যার উপর অত্যাচার করিবার কারণে সেই বন্দী জগৎসিংহ ওস্মানকে ভ্রূকুটি দেখাইলেন এবং ওস্মান তাহাতে ভয় পাইলেন। বোধ করি ঠাকুর কোন দিন তাঁহার দেওয়া কোন বন্দীর হাতে অপদস্ত হইয়া থাকিবেন তাহাই, সেই সজীব কল্পনাটি তুলিয়া আনিয়া এইস্থল উজ্জ্বল করিয়াছেন। ঠাকুরের কল্পনা বর্ণনা করিতে ভাষাতেও শব্দ পাওয়া ভার।)

৮ ✻ বসন্তের কোকিলবালা। ✻ ৮

বীরেন্দ্রসিংহের মৃত্যুতে, বিমলার প্রাণে বাতাস লাগিল, তিলোত্তমা দুই এক দিন কাঁদিয়াছিলেন কিন্তু বিমলা তাঁহাকে শীঘ্রই পিতৃশোক ভুলাইয়াদিলেন। বিমলা এখন মনপ্রাণ ঢালিয়া কৎলুখাঁর সেবা-ভক্তি করেন। তিনিও তাঁহার সেবার অনাদর করেন না। আর একদিন মাত্র আয়েশা কথায় কথায় তাঁহাকে—'না মা, আমি কিছু খাইব না' বলিয়াছিলেন। এতেই তিনি মনে মনে আয়েশার মাতা ও কৎলুখাঁয়ের পত্নী হইয়া, বাতাসের শিরে আশার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে নবাবকে নেকা করিবেন, জগৎসিংহের সহিত আয়েশার এবং ওস্মানের সহিত তিলোত্তমার বিবাহ দিবেন। এই সকল বেশ্যাবুদ্ধিগত সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করিয়া, তিলোত্তমাকে ওস্মানের সহিত আলাপ করিবার অনুমতি করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ ওস্মান তিলোত্তমা ও বিমলাকে বেশ্যাধম বলিয়া জানিতেন। তিলোত্তমার নয়নবান কোনই কাজে আসিল না। একদিন তিনি প্রকাশ্যরূপেই ওস্মানকে বলিলেন। "আপনার যৌবনকাননে কোকিলের গান শুনিতে পাই না কেন?" তাতে ওস্মান উত্তর করিলেন। "আমাদের গৃহে দুইটি কোকিলভক্ষী বাজপক্ষী আসিয়াছে—তাই।" এই আলাপের পর তিলোত্তমা ওস্মানের আশা ত্যাগ করিয়া আবার জগৎসিংহের জন্য চঞ্চল হইলেন। বিমলাও তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। "তুমি আর ওস্মানের আশায় থাকিয়া সময় নষ্ট করিও না। এখনি যাইয়া জগৎ-

সিংহের সহিত সাক্ষাৎ কর।" তিনি মনে মনে আবার স্থির করিয়াছিলেন, আয়েশা জগৎসিংহকে বিবাহ করিতে পারে না।"

তিলোত্তমা বলিলেন। "এতদিন পর গেলে তিনি কি মনে করিবেন?"

বিমলা। "আমরা বন্দিনী ইত্যাদি কথায় বুঝাইয়া দিও।—যাও তুমি শীঘ্র যাও! আয়েশা প্রায় দুই তিন মাস হইতে যাতায়াত করিতেছে; কি সর্ব্বনাশ করিল সেই জানে। সে আবার তোমা চেয়ে চতুরা।"

তিলোত্তমা। "আমি মুসলমানদিগকে বেশ চিনিয়াছি। আয়েশা দশ বৎসর ধরিয়া জগৎসিংহের নিকট যাতায়াত করিলেও, সে যবনী হিন্দুপতি গ্রহণ করিবে না। আমি এখনি যাইতেছি, এখনি জগৎসিংহের মনোগত ভাব সকল সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি। —তা না! আয়েশা কি কৎলুখাঁর কন্যা?" বিমলা বলিলেন। "কি জানি মা, সে তো কৎলুখাঁকে পিতা বলিয়াই ডাকে।" এই বলিয়া বিমলা তিলোত্তমাকে সঙ্গে করিয়া কুটুম্বাবাসে গমন করিলেন। বিমলা সেই প্রাঙ্গণস্থ আম্র বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নভেল ঠাকুর বলিতেছেন—

"তিলোত্তমা মরাল গমনে যাইয়া, জগৎসিংহের নীরব কুটীরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। (জগৎসিংহ তাঁহাকে আয়েশা বিবেচনা করিয়া বলিলেন।) "দ্বার-দেশে কেন, ভিতরে এসনা।" (তিলোত্তমার পাপপদ কাঁপিতে লাগিল অপবিত্র মন ভিতরে যাইতে সাহস করিল না।)—রাজকুমার তিলোত্তমার নিকট আসিলেন, নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। তিলার্দ্ধ-জন্য নয়নে নয়নে মিলিত হইল; রাজপুত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। তিলোত্তমার ক্ষণ-প্রস্ফুটিত হৃদয়ের আনন্দপদ্ম সঙ্গেসঙ্গে শুকাইয়া গেল। রাজপুত্র কথা কহিলেন। "কে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?" (পাঠক, বুঝিয়া যাইবেন, ঠাকুরের যেমন জোরবুদ্ধি তেমনি জোর কলম কি না?)

তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধিল।—'বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা?" এখনকার কি এই সম্বোধন! জগৎসিংহ কি তিলোত্তমার নামটিও ভুলিয়া গিয়াছেন। রাজপুত্র পুনর্ব্বার কথা কহিলেন। "এখানে কি অভিপ্রায়ে?"

"এখানে কি অভিপ্রায়ে!" কি প্রশ্ন! তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। চারিদিক, কক্ষ, প্রদীপ, শয্যা, প্রাচীর সকলই ঘুরিতে লাগিল। অবলম্বনার্থ প্রাচীরে মস্তক রাখিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকুমার বলিলেন। "তুমি কেন যন্ত্রণা

পাও! ফিরিয়া যাও! পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হও।” এই বলিয়া রাজকুমার তাহার সম্মুখে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

“তিলোত্তমার আর ভ্রম রহিল না। (কি কথার ভ্রম?) অকস্মাৎ বৃক্ষচ্যুত বল্লীর ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।” তারপর গোলাপপাশ, আতরদান, আদি মাথায় দিয়া তিলোত্তমার ভাণমূর্চ্ছার উপশম হইল। (পাঠক একবার নভেল ঠাকুরের চিত্রখানি দেখুন। বুড়া-প্রেমের বাহার কেমন কচি কচি পাতায় সাজাইয়াছেন দেখুন! ঠাকুর এই তিলোত্তমা এবং এই জগৎসিংহকে, বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় প্রায়, নির্জ্জন ও অবৈধ বাসরে একত্র করিয়া দেখাইয়া চুকিয়াছেন। সকলই দেখাইয়াছেন কেবল লজ্জার অনুরোধে গর্ভটা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখানে এমন ভাবে দেখাইতেছেন যেন; শৈলেশ্বরের দেবমন্দিরে সাক্ষাৎ হইবার পরই এই সাক্ষাৎ হইতেছে। মাঝখানটা যে সকল খেলা হইয়া, সেই পবিত্র প্রেমের অবস্থা কিরূপে দাঁড়াইয়াছে; ঠাকুরের মাথায় সে কল্পনা উদয় হইল না কেন? এমন অবস্থায় তিলোত্তমা উত্তর করিবে না, তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে সে মুর্চ্ছিতা হইবে, আকাশময় অন্ধকার দেখিবে কেন?—তিলোত্তমার নিশ্চয়ই পাপ ছিল, নিশ্চয়ই সে ওস্মানের প্রেম অনুসন্ধান করিতেছিল। জগৎসিংহের তিনটি কথাতেই তাহার সেই সন্দেহ প্রকাশ পাইয়াছে। তিলোত্তমা যখন ‘একি প্রশ্ন’ বলিলেন, তখন তিনি কি ভাবিয়াছিলেন?—‘তবে কি কুমার জানিতে পারিয়াছেন যে আমি ওস্মানের জন্য ঘুরিতেছি।’ তিলোত্তমায় যদি পাপ না থাকিত, তবে তিনি এইরূপ উত্তর করিতে পারিতেন না কি?—

প্রশ্ন। “কে, বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা” উত্তর। “তাই তো, নামটি কে ভুলাইয়া দিল। আমার নাম যে তিলোত্তমা।—যাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বে বাসরঘরে স্থান দিয়াছিলাম, তিনি সেই বাসর প্রহসনটিকে চিনিতে পারেন না কেন? ইহাই কি ভ্রমরের ধর্ম্ম?”

প্রশ্ন। “এখানে কি অভিপ্রায়ে?” উত্তর। “দেখিতে আসিয়াছি আমার ভ্রমর এখন কোন পুষ্পে বসিয়াছে।” প্রশ্ন। “তুমি কেন যন্ত্রণা পাও, ফিরিয়া যাও, পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হও।” উত্তর। “ফিরাইয়া দাও ফিরিয়া যাইব! পূর্ব্ব কথা জীবন থাকিতে ভুলিব না।” এরূপ বলিবার মুখ তিলোত্তমার ছিল কি?

তিলোত্তমা চলিয়া গেলে, পার্শ্বের কক্ষ হইতে আয়েশা আসিয়া জগৎসিংহের নিকট বসিলেন এবং নানাপ্রকার রসের কথা বলিতে লাগিলেন। কথায় কথায় বলিলেন। "বাবা এবার যেরূপ পীড়াগ্রস্থ হইয়াছেন, বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাই-বেন না। আপনার সহিত সন্ধির কথা স্থির হইল কি?"

জগৎসিংহ। "এখনও কোন কথার পাকাপাকি হয় নাই।—তবে সন্ধি করিতে আমার অমত নাই।" আয়েশা। "এই সঙ্গে, আমাদের সন্ধিটা চিরস্থায়ী করিয়া লইতে পারিবেন না কি?" কুমার। গতবারের সাক্ষাতে, ভাবে ভাবে কতক কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনিও আমার মনের কথা বুঝিয়া গিয়াছেন। বোধ করি, সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলে, তিনিও এ কথায় স্বীকৃত হইবেন।"

আয়েশা। "আপনি, আমাদের কথাটা তৎপর পাকাইয়া লউন।" কুমার। "কল্য প্রভাতেই আবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তুমি আমাকে যে এক ভয় দেখাইয়াছ; তাহাতে আমার নিদ্রা হইতেছে না।"

আয়েশা। "না ভাই ভয় দেখান কথা নয়।—সত্য সত্যই এ মাসে আমি চাঁদ দেখিতে পাই নাই।" কুমার। "চিন্তা নাই! আমি সপ্তাহের মধ্যেই সকল কাজ সারিয়া লইব। তা তুমি কি নবাবের ঔরসজাতা কন্যা নও।"

আয়েশা। "যদি না হই! তবে কি আপনি আমাকে গ্রহণ করিবেন না।"

রাজকুমার আয়েশার পদ্মনিভ বদনমণ্ডলে চুম্বন করিয়া সাদরে চিবুক ধরিয়া নাচাইয়া নাচাইয়া বলিতে লাগিলেন। "আয়েশা! এ দেহে জীবন থাকিতে. জগৎ-সিংহ তোমাকে ভুলিবে না। তুমি যদি,কোন নীচকুলোদ্ভবা কন্যাও হও,তথাপি আমার ত্যজ্য হইবে না। কিন্তু যদি, আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে, কৎলুখাঁর মৃত্যু ঘটে। তখন তো ওস্মান সর্ব্বে সর্ব্বা হইবে।"

আয়েশা। "তাতে কি হইবে!" "জগৎ। "সে যেরূপ পাকা মুসলমান, নিশ্চয়ই আমাদের এ বিবাহে বাধা দিবে।" আয়েশা। "আমি আপনার সহিত চলিয়া যাইব, আপনি আমাকে লইয়া যাইবেন না কি?" কুমার। "ওসমান্ তোমাকে যাইতে দিবে কেন?" আয়েশা। "আমার পায়ে শীকল দেবেন নাকি?"

(পাছে গোবর ঘাঁটিলে কীট বাহির হয় সেই ভয়ে আমাদের বুদ্ধিমান ঠাকুর, এই অবৈধ প্রেমটা ফুটাইয়া আঁকেন নাই। গায়ে বাজিলে কি করিব, আমরা সত্যের সাপেক্ষ, কাজেই ঠাকুরের ছায়াময় ছবিটিকে ফুটাইয়া আঁকিতে হইল।)

৯ * প্রেমপুরীতে ভাইভগ্নী। * ৯

ঠাকুর বলিতেছেন ঃ—(আয়েশা এবং জগৎসিংহে এইরূপ রসালাপ ও জ্ঞানোপহা লীলা নিচয়ে সময়াতিবাহিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে, "প্রকোষ্ঠ প্রাকারে আর এক তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া পড়িল। কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া উভয়ের নিকট দাঁড়াইল, তথাপি দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্তম্ভের ন্যায় থাকিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিলেন। "আয়েশা এ উত্তম !"

"উভয়েই সেই সুখের নেশা কাটাইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন,—ওস্‌মান। আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন। "কি উত্তম ওস্‌মান।" ওস্‌মান। "নিশীথে একাকিনী বন্দী সহবাস উত্তম।" আয়েশা। "এই বন্দীর সহিত অলাপ করা আমার ইচ্ছা, আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম ; সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।" (ঠাকুর এস্থলে পূর্ণমাত্রায় তাঁহার নিজ অভিরুচি প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা ভাইভগ্নীর মত হইয়াছে কি ?)

ওস্‌মান। "প্রয়োজন আছে না আছে কাল নবাবের মুখে শুনিবে।"

আয়েশা। "তাঁহার প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে দিব, তোমার চিন্তা নাই।"

ওসমান। "আর যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি।" (ঠাকুরের কল্পনাটা দেখুন।)

আয়েশা রোষাবেশে পরিষ্কার কথায় বলিলেন। "ওস্‌মান যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। এই বন্দীভিন্ন অন্য কেহ, যাবজ্জীবন আমার হৃদয়ে স্থান পাইবেন না। ইত্যাদি।" (ভগ্নীভ্রাতায়, এইরূপ অবস্থায় এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর, মোসলেম-মহিলাদল মধ্যে অতি বিরল, তবে যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা এরূপ কল্পনা করিতে পারেন। বিধবা ভগ্নী পরপুরুষের সহিত পলায়নকালে, যদি সৌব সহোদর কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন সে যে প্রকার প্রখরা হইয়া থাকে, এ স্থলে ঠাকুর সেই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ? ঠাকুর এইরূপে আয়েশাকে সপ্তমস্থরে তুলিয়া, আবার সহসা জলদে নামাইয়াছেন। কিন্তু সেই জলদে নামিবার আস্ত সোপানটা ঠাকুর গিলিয়া লইয়াছেন। আমরা সেই প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান নিম্নে দেখাইয়া দিতেছি। মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত সোপান, পরিপাক করিতে না পারিয়া, ঠাকুর স্থানান্তরে গিয়া উদ্গীরণ করিয়াছিলেন।)

ওস্‌মান আয়েশার কথার উত্তর না করিয়া ; কুমার জগৎসিংহের হস্তে একখানি পত্র দিয়া কহিলেন। "এই পত্রখানি বিমলা আপনাকে দিয়াছেন। পত্রের সমস্ত

অংশ আমাদের রাজনৈতিক প্রথামত এবং বিমলার অনুমতিক্রমে আমি পাঠ করিয়াছি। এই পত্রের উপখ্যানোপলক্ষে বিমলার না জানা থাকিবার কারণে, যেখানে যাহা অপ্রকাশ আছে; আমি তাহা জানি। আপনি শুনিতে ইচ্ছা করিলে তাহা আমি অকাতরে বলিতে পারি।"

কুমার জগৎসিংহ পত্রখানির আদ্যন্ত উত্তমরূপে পাঠ করিয়া, ওস্মানখাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "আপনি ইহার অবশিষ্টাংশ কি জানেন আমাকে তাহা জানাইয়া বাধিত করুন।"

ওস্মান। "আমি বলিব। যদি আয়েশা সে কথার সত্যাসত্যের অনুমোদন করিতে স্বীকৃতা হন।—এবং সত্যকে অলীক বলিয়া প্রমাণ করিতে না চান।"

আয়েশা বলিলেন। "আয়েশা মিথ্যা বলিতে শিক্ষা পায় নাই।"

ওস্মান আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি এ বাড়ীতে কত দিন আসিয়াছ?"

আয়েশা। "দশ বৎসর হইবে। তখন আমার বয়স ৭।৮ বৎসর মাত্র।"

ওস্মান। "তোমার আগেকার নাম মনে আছে কি?" আয়েশা। "আছে। আমার বর্ণপরিচয়ের দুইস্থলে দুইটি নাম লেখা আছে।—শ্রীমতী তাড়কা এবং শ্রীমতী আইশাশ।—দুইটি নামই আসমানীর হাতে লেখা।—তিনি আমাকে পালন করিতেন।" ওস্মান। "অভিরাম স্বামীকে তুমি কি বলিয়া ডাকিতে?"

আয়েশা। "আমি তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিতাম।" ওস্মান। "তোমার কোন্ দেশে কোথা জন্ম, সে সকল কথা অভিরাম স্বামীর মুখে শুনেছিলে কি?"

আয়েশা। "শুনিয়াছি, দিল্লীতে মহারাজ মানসিংহের অন্তঃপুরে। তিনি নাকি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাই আমাকে তাড়কা বলিত।" ওস্মান। "তোমার পিতা বা মাতার নাম জান কি?" আয়েশা। "না।" ওস্মান খাঁ হাসিয়া বলিলেন। "এই কথাটা মানিলে না।"

পরন্তু ওস্মান খাঁ, আয়েশাকে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। জগৎসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "ইনি বিমলার কন্যা।—তবে বীরেন্দ্রসিংহের ঔরসজাতা কি না; তাহা আপনি বিমলার পত্রটীকে সাক্ষ্য করিয়া স্থির বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিবেন।—এই আয়েশার উপর অনুরক্ত হইয়া, আমি আমার সর্ব্বশরীর ভস্মীভূত করিয়া রাখিয়াছি। পিতার অমত থাকা সত্ত্বেও, মনে মনে এমনি সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছি যে, যদি আমার সম্মুখে পিতার স্বর্গলাভ হয়, আমি এই কুমারীর প্রেমলাভ

করিব।—এবং সেই প্রত্যাশায় আমি একাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত আছি। আয়েশা যে মুহূর্ত্তে, আপনার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া, যে কয়টি শ্রুতিকটু কথা আমার সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই এই ওস্মান যে কাহার কাহার রক্তে এই কুটুম্বাবাস রঞ্জিত করিত; রাজকুমার! আপনি তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন।—প্রথম কুমার জগৎসিংহের মুণ্ডপাত করিতাম, তারপর আপন মস্তক আপনি উড়াইতাম। কিন্তু আয়েশার প্রতি আমার অসি কিছুতেই উঠিত না। তবে, কেন আমি তাহা করিলাম না! কেন ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম! সে কথা শুনিলে আরও বিস্ময়াপন্ন হইবেন।—এস্লাম রুচি, আপনার রুচির মত কুৎসিত এবং অপবিত্র নহে। ঈশ্বর মোমেনকে জঘন্য কার্য্য, হারাম ও অখাদ্য আদি, নাজাস্ নাপাক (অপবিত্র) হইতে রক্ষা করেন। আমি আয়েশাকে স্বীয় পবিত্র পালঙ্কে স্থান দিবার পূর্ব্বে, ঈশ্বর আমাকে ঐ নাপাক হইতে পৃথক থাকিবার আদেশ করিয়াছেন। আমি আয়েশাকে চাহি না। আপনি নিরাতঙ্কে উহার প্রেমলাভ করিতে পারেন। যখন পিতা, আয়েশাকে কন্যা বলিয়াছেন, তখন যদি আপনি উহাকে গ্রহণ করেন, আমি সানন্দে উহাকে আপনার করে সমর্পণ করিয়া দিব।"

(পাঠক, নভেল ঠাকুরের জালিয়াতীটা দেখুন।—ওস্মান খাঁ, কৎলু খাঁয়ের পুত্র নহে, ভ্রাতুষ্পুত্র, আবার আয়েশা নাকি কৎলুখাঁর কন্যা, তিনি ওসমানের প্রেমিকা। এখানে ভাই ভগ্নীর প্রেমটা সত্য, কিন্তু ঠাকুর উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে দিয়াছেন।—ঠাকুর এ কল্পনা পাইলেন কোথা? এরূপ তো আইভান হো'তে নাই। ঠাকুর তো একজন মহা রসিক মানুষ ছিলেন, বোধ হয় এইরূপ রসিকতা করিতে গিয়া, হাড়ে হাড়ে সেক পাইয়া থাকিবেন। সেই মনের জ্বালাটা ওস্মানের উপর দিয়া ঝাড়িয়াছেন। যেরূপ নীচ রুচি অবলম্বন করিয়া দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছেন, এরূপ নীচাভিনয় আমরা ডোম চামারদের অভিনয়স্থলেও দেখিতে পাই না। এত গুণ না থাকিলে ঠাকুর একেবারে সাহিত্যসম্রাট উপাধি পাইবেন কেন?)

(ফুল চোর মালি, ইস্পাৎ চোর কামার, সোনাচোর স্বর্ণকার, আর দানা চোর পাটওয়ার, ইহারা চুরিও ছাড়িতে পারে না, জিনিষেও 'ভক্তাইতে' পারে না। ঠাকুরও তাই। পাঠক এইবার দেখুন, আয়েশা সপ্তম স্বরে উঠিয়া, কোন্ সিড়ী ধরিয়া জলদে নামিয়াছিলেন। এইবার দেখুন সেই অসামঞ্জস্য আর আছে কি না?)

ওস্মানের কথায় জগৎসিংহ কোন উত্তর করিলেন না। আয়েশা ওস্মানের

নিকট ক্রটী স্বীকার করিয়া কহিলেন। "ওসমান, আমি আপনার প্রাণে ক্লেশ দিয়াছি, আমাকে মার্জ্জনা করুন। এ আমার অনুচিত হইয়াছে। ইত্যাদি।"

ওসমান আর তথায় দাঁড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন।—আয়েশা জগৎসিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "রাজকুমার! আপনিও আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমার সকল আশা ফুরাইয়াছে।" এই বলিয়া আয়েশাও চিন্তামগ্নচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; (পাঠক, ধীর চিন্তায় বিবেচনা করিয়া বলুন, নভেল ঠাকুর এই মণিময় কথামালার দানাপহরণ করিয়াছিলেন কি না?)

সকলে চলিয়া গেলে। জগৎসিংহ বিমলা প্রেরিত পত্রখানি লইয়া ধীর চিত্তসহ পাঠ করিতে বসিলেন।—নভেল ঠাকুরের লিখিত পত্রখানি, আমরা ব্রাকেটমধ্যে সংশোধিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—ঠাকুর কেমন আপন মুখে আপনি ধরা দিতেছেন দেখুন।)

১০ * বিমলার পত্র। * ১০

পত্রমধ্যে বিমলা বলিতেছেন।—"যুবরাজ!—আমি মহা পাপিয়সী, বহুবিধ, অবৈধ কার্য্য করিয়াছি। আমি মরিলে লোকে (আমাকে) মন্দ বলিবে। একদিনের তরেও আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি আপনার আত্মীয় স্বজনমধ্যে গণ্য, হইব। (অর্থাৎ মানসিংহ আমাকে অবশ্য আবার গ্রহণ করিবেন।) * *

গড়মান্দারণের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে, শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের বাস। শশিশেখর কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পুত্র। শশিশেখর যৌবনকালে যথারীতি বিদ্যানুশীলন করিয়াছিলেন; গড়মান্দারণে একটি পতিবিরহিণী রমণী ছিলেন। সেই সুন্দরী শশিশেখরের নয়ন পথের পথিক হইল। অপরাধীপুত্রকে তদীয় পিতা বহুবিধ ভৎর্সনা করায়, তিনি দেশত্যাগী হইয়া, কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া তিনি এক শূদ্রীকন্যাকে স্বীয় উপপত্নীরূপে পান। (উপপত্নী করাই তাঁহার ব্যবসায়, সেই জন্য তিনি আজন্ম বিবাহ করেন নাই।) অধিক কি বলিব, সেই শূদ্রীকন্যার গর্ভে, শশিশেখরের ঔরসে এই হতভাগিনীর (বিমলার) জন্ম হইল। (লম্পটরাজ) শশিশেখর কাশী হইতে পলায়ন করিলেন।

১৪ বৎসর পর জানা গেল যে, পিতা শশিশেখর নাম পরিত্যাগ করিয়া, অভিরাম

স্বামী নাম ধারণ করিয়া দিল্লীতে অবস্থান করিতেছেন। (সেখানে তিনি যে, অগণিত উপপত্নী করিয়া, দুষ্ট রমণীদলমধ্যে কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবেন না।—পূর্ণ যৌবনের আকর্ষণে পথিমধ্যে সঙ্গী পাইব ভাবিয়া), আমি একাকিনী পিতার নিকট গমন করিলাম। তিনি আমাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন।

গড়মান্দারণে, আমার পিতার ঔরসে সেই পতিবিরহিণী রমণীরও একটি কন্যারত্ন জন্মিয়াছিল। আর অধিক কি বলিব সেই (দেবী বিনিন্দিতা) কন্যারত্নই দুর্গেশনন্দিনীর গর্ভধারিনী ছিলেন। (পাঠকের মধ্যে কেহ, হাসিবেন না, ঠাকুর হিন্দুকুলে কুলীনকন্যার জন্ম দিতেছেন।—এবং তিনি তাঁহার বাকপটুতাবলে, এই কন্যাকে সমগ্র সমাজের পূজনীয়া করিয়া দেখাইয়া যশের উপর যশঃ তার উপর সম্রাট উপাধি পাইয়াছেন! হিন্দুসমাজ যে ঐরূপ অপবিত্র নহে, ঠাকুর কি তাহা জানিতেন না?) বীরেন্দ্রসিংহ তখন দিল্লীতে থাকিতেন। পিতার নিকট তাঁহার যাতায়াত ছিল। (তিলোত্তমার মাতা মরিয়া গেলে) আমি বীরেন্দ্রের নয়ন পথের পথিক হইলাম। আমি শূদ্রীকন্যা বলিয়া আমাকে তিনি গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। পিতা আমাকে মহারাজ মানসিংহের অন্তঃপুরে রাখিয়া, (অন্তঃপুরে নহে।) দেশভ্রমণে গমন করিলেন।—যুবরাজ তুমি আমাকে চেন না, তুমি তখন দশমবর্ষীয় বালক মাত্র। (তোমার তখন লোক চিনিবার বয়স হয় নাই।—আহা ঠাকুরের বলিহারি যাই কল্পনা শক্তি।—কি মনোমুগ্ধকর আক্কেল ও অভিজ্ঞতা!)

মহারাজ মানসিংহের কণ্ঠে, কুসুমমালার তুল্য, অগণিত রমণী গ্রথিত থাকিত। (তন্মধ্যে আমিও একজন হইলাম।) আমার গর্ভচিহ্ন পরিলক্ষিত হইলে। একনিশা শয়ন মন্দিরে শয়ন করিতে ছিলাম, অকস্মাৎ কে আমার পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। (আমি মহারাজ আসিয়াছেন মনে করিয়া নীরব রহিলাম।) এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজ আসিলেন। এবং তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন; তিনি বীরেন্দ্রসিংহ। মহারাজ তাঁহাকে কারাবদ্ধ ও আমাকে গৃহবহিস্কৃতা করিলেন। এক বৎসর পর বীরেন্দ্রসিংহ আমাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, মহারাজ তখন তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। (যুবরাজ! আমারও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল, সেই বিতাড়িত কন্যাকে লোকে তাড়কা বলিয়া ডাকিত।) বীরেন্দ্রসিংহ আমাকে এই পণে বিবাহ করিলেন যে, (তিনি তাড়কাকে গ্রহণ করিবেন না এবং) আমি তাঁহাকে কখনও স্বামী বলিতে পাইব না। আমার স্বামী তাঁহার দিল্লীত্যাগকালে আমাকে এবং

আসমানীকে সঙ্গে করিয়া গড়মান্দারণে আসেন। (৪ বৎসর পর তাড়কাকে লইয়া আমার পিতাও গড়মান্দারণে আসেন। তিনি আদর করিয়া তাড়কাকে আইশাশ বলিয়া ডাকিতেন।—আসমানী তাড়কাকে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে মুসলমান ধর্ম্ম মতে প্রতিপালন করিতে থাকে। একদিন সে একা পাঠশালায় গমন করিতে-ছিল, পথ হইতে পাঠানেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। আমার সে কন্যা একাল পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ।) আমার পরিচয় দেওয়া শেষ হইল।"

কুমার জগৎসিংহ, বিমলার পত্রখানি কয়েকবার পড়িলেন। এবং নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। "আয়েশা তবে কাহার ঔরসজাতা কন্যা? আমি এ কি করিলাম! আয়েশা কি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা হইতে পারে না। কেমন করিয়া হইবে?—বিমলার গর্ভচিহ্ন পরিলক্ষিত হইবার পর, বীরেন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে বীরেন্দ্র যে বিমলার গৃহে যাইত না তাহার প্রমাণ কি?—আমার পিতার সহিত পরিণয় হইবার পূর্ব্বে তো তাঁহার পরিণয় বীরেন্দ্রের সহিত ছিল।—যাহা হউক, আয়েশা জারজা কন্যা, ওস্‌মান তাই তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে। তবে আমি কেমন করিয়া লইব।—কেন লইব না? এ দেহে জীবন থাকিতে আয়েশাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জগৎসিংহ পালঙ্কে আসিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা আসিল না, আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আর যদি আয়েশা পিতারই ঔরসজাতা কন্যা হয়, তবে আমি এ কি সর্ব্বনাশের কার্য্য করিলাম!—পিতা বিমলাকে তাহার গর্ভাবস্থায় ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেইরূপ আমিও কি আয়েশার গর্ভাবস্থায় তাহাকে বনবাস করিব?—না না তা পারিব না। আয়েশা কখনই পিতার কন্যা নহে। পিতা দেবতার তুল্য, তিনি কি লম্পট ছিলেন। দুষ্টা বিমলা স্বকীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য ঐরূপ অলীক বলিয়াছে। একে শূদ্রী আবার জারজা, দুষ্টার কথায় বিশ্বাস করিতে আছে! দুষ্টা যদি সত্য সত্যই আমাদের অন্তঃপুরে ছিল আর তখন আমার বয়স দশবৎসর তবে আমি ওকে চিনিব না। বেটী কি সামান্য জালিয়াৎ! আমি ওর কথা শুনিয়া আয়েশাকে পরিত্যাগ করিব না।—তবে আয়েশা জারজা,—হইলই বা জারজা, তার রূপ ও গুণ তো আর জারজা নয়! আর যখন এ কথা অন্য কাহারও জানা নাই, এবং জানিতেও দিব না, এমন কি আয়েশা-কেও বলিব না। তবে আয়েশাকে গ্রহণ করিতে দোষ কিসের? এই যে বীরেন্দ্র

সিংহ দুইবার জারজকন্যা বিবাহ করিল! আমি কি একবারও পারি না? কেন পারিব না, যদি পারিব না তবে আয়েশাকে কলঙ্কিনী করিলাম কেন? আমি তাহাকে ত্যাগ করিব, আর সে চিরকালের জন্য আমার কলঙ্ক বহন করিয়া বেড়াইতে থাকিবে; ইহা আমি আমার কোন বিচারেই করিতে পারিব না।'

এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব হইলেন; তারপর আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। —'সমাজের ভয় করিতেছি।—আমাদের সমাজ কোথায়?—আমরা যাহা করি তাহাই সমাজ। তবে এই বঙ্গদেশের সমাজ, আমার এ কার্য্যে ঘৃণা করিবে কিনা, একবার সেই কথা ভাবিয়া দেখা উচিত।—তাহারা জানিতে পারিলেও নিন্দা করিবে না। বরং আয়েশাকে মুসলমানগৃহে যাইতে দিই নাই বলিয়া, তাহারা কত আনন্দ করিবে। স্বীয় দোষরাশি পরদ্বারে বহন করিতে এবং পরজাতীয় গুণরাশিতে স্বীয় সম্প্রদায়কে সাজাইতে, ভবিষ্যতে কত গ্রন্থকার জন্মিবে, তাহারা আমাদের মত গুণধরের মন্দ চরিত্র সকল, ভূরি ভূরি প্রসংশাসহ এমন উত্তম ও উজ্জ্বল করিয়া গ্রন্থে লিখিবেন যে, তাহার পাঠে সকলেই আমাদিগকে পূজা দিতে অগ্রসর হইবে।—আমি জানি উহারা জগৎরাষ্ট্রে অসারকল্পী এক এক জন এক এক মহা মহাশয় ব্যক্তি জন্মিবে। উহাদের সেই সকল দুষ্ট গ্রন্থের পাঠে, দেশের দশ আনা লোক, দুষ্টবুদ্ধি ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট লম্পট শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জগৎসিংহের নিদ্রা আসিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরই সে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'আমি তো হিন্দু নহি, রাজপুতও নহি?—তবে আমি কি?—আমি সকল ধর্ম্মেরই একজন পাণ্ডা। আমাকে সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায় বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ওসমান, আমার মুসলমান সমাজের ভাই। সে যখন আয়েশাকে ঘৃণা করিয়াছে, আমিও তাহাকে ঘৃণা করিব।—বীরেন্দ্রসিংহ আমার হিন্দু সমাজের ভাই।—সে যখন, জারজা কন্যা গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে;—আমি তাহার কন্যা তিলোত্তমাকে বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই ভাবী হিন্দু সমাজের দুর্গেশনন্দন ও দুর্গেশনন্দিনী হইয়া সকলের পুজনীয় হইতে পারিব। আমি তাহাই করিব।— তখন গ্রন্থকারেরা আমাকে তাঁদের সমাজগত করিয়া লইবে। আমি তিলোত্তমাকে বিবাহ করিলে তাঁহাদের মনোনত কার্য্য করা হইবে।

(নেপথ্যে গান)

বেশ প্রেম করেছিলে দু'জন মিলে ভাই ভগিনী,
সরমে চোখ খোলে না, মুখ চলে না, এ যে বিষম অসৎবাণী।
পাপের কুফল গেছে ফলে, এ ফলটিরে দাওনা ফেলে,
এ বোনে বনে ফেলে ঢাক সরম কবর খনি।

১১ ❋ একাসনে ত্রিজারজা। ❋ ১১

কৎলু খাঁর অন্তঃকাল উপস্থিত হইল। গৃহবাসীকে কাঁদাইয়া, বিমলার বিদগ্ধ হৃদয়ে নূতন প্রেমের শেল বিদ্ধিয়া দিয়া, তিনি তাঁহার পবিত্র চরিত্র লইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। যে মরে, সে একাই মরে, তার সঙ্গে অন্য কেহই মরে না। মৃতব্যক্তির সহিত কেহই আপন, আহার বিহার, ভোগ, বিলাস, আনন্দ, উৎসবাদি ত্যাগ করে না। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে কৎলুখাঁকে ভুলিয়া গেল। কৎলু খাঁ তাঁহার মৃত্যু-কালে, জগৎসিংহকে ডাকিয়া, দিল্লীশ্বর আকবরের সহিত সন্ধি করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। সেহেতু তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের জন্য কোনরূপ ব্যাধি রাখিয়া যান নাই; এখন ওস্‌মান খাঁ সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন। (ইতিহাস দেখুন।)

জগৎসিংহ এই সন্ধি করিয়া কৎলুখাঁর কারাগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় বিস্তারিত পক্ষে উড়িয়া পলায়ন করিলেন। (এখানে নভেল ঠাকুর বলিয়াছেন যে, "ওস্‌মান খান জগৎসিংহের পশ্চাতবলম্বন করিলেন, এবং এক নিভৃত শালবন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জগৎসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "এক আয়েশার দুইজন স্বামী হইতে পারে না। অতএব আইস, আমরা যুদ্ধ করিয়া একজন মরি।" কথাটা নিতান্ত বাতুলোক্তিবৎ। তাই আমরা কল্পনায় ঠাকুরের প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। "ঠাকুর! আয়েশা তখন কোথায় ছিল।" ঠাকুর বলিলেন। "ওস্‌মানের গৃহে।" আমরা। "তবে ওস্‌মান কেন যুদ্ধ করিবে?" ঠাকুর বলিলেন। সাজাইবার গুণে মিথ্যাকে সত্য, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দেখাইয়া, পাঠকগণকে উদভ্রান্ত করাই আমার মত গ্রন্থ-কারের গুণ ও গৌরব, আর যে গ্রন্থকার যে বক্তা যৎদূর অলীক বলিবে, এ কালের পাঠক ততই তার উপাসক্ত হইবে। সত্য বলিয়া যশঃ ও ধন অর্জ্জন করা একালে

অসম্ভব। আমরা। "তা বেশ! কৎলু খাঁ কি বিমলার অস্ত্রে মরিয়াছিল?" ঠাকুর। "হাঁ, তাহারই নূতন প্রেমের অস্ত্রে মরিয়াছিল। শতপ্রহরীযুক্ত অন্তঃপুর, তার মধ্যে জনতাপূর্ণ কক্ষে বিমলা কৎলুখাঁকে ছুরিকা প্রহার করিয়া, পরিষ্কার পলায়ন করিল এবং নির্ব্বিঘ্নে গড়মান্দারণে যাইয়া বসিয়া রহিল, এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিবার লোক বঙ্গদেশে যে কত আছে, আমার গ্রন্থ তাহা গণিয়া বলিতে পারে।"

আমরা। "নভেল ঠাকুর! তিলোত্তমার বিবাহটা কি পবিত্র ধরণে হইয়াছিল?"

ঠাকুর উর্দ্দু ভাষায় বলিলেন। "জেয়াসা রুহ ওয়সাহী ফেরেশ্‌তা।

হতভাগিনী আয়েশারই সর্ব্বনাশ হইল। তিনি যদিও তাঁহার অপবিত্র জন্ম-কাহিনীর অধিক কিছু জানিতে পারেন নাই। তথাপি ওস্‌মানের কথায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি বিমলার জারজা কন্যা। তাঁহার পিতা যে, কে ছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।—ওস্‌মান তাঁহাকে আর গ্রহণ করিবেন না। জগৎ-সিংহই কি লইবেন? কাজেই আয়েশার জগৎ অন্ধকার। শোণিত-শোষিণী-দুশ্চিন্তা, তাঁহাকে দিন দিন মলিন করিতে লাগিল। আয়েশা উদাসিনীর ন্যায়, একবার কক্ষের বাহিরে যাইতেছেন, একবার ভিতরে আসিতেছেন। কখন বা বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া শূন্য নয়নে চাহিতেছেন। যে দিকে চাহিতেছেন, চাহিয়াই আছেন। অঙ্গের গহনাগুলি খুলিতেছেন আবার পরিতেছেন। যেখানে বসিতেছেন বসিয়াই আছেন। দাঁড়াইতেছেন তো দাঁড়াইয়া আছেন। কেহ কথা বলিলে মুখ ফিরাইয়া লন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার দিকে না চাহিয়াই উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে থাকেন। ওস্‌মান খাঁ তাঁহাকে তাঁহার আবাসে থাকিতেও বলেন না, আবাস হইতে যাইতেও বলেন না।

রূপসী আয়েশা একদা বহির্ব্বাটীর কুটুম্বাবাসের প্রাঙ্গণস্থিত আম্র বৃক্ষের ছায়ায়, এক সোফার উপর উপবেশন করিয়া, এক এক বার সেই মনোহর স্মৃত্যুদ্দীপক শূন্যাবাসপানে চাহিয়া, হতাশের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন।—"হায় হায়! যৌবনের অসার নেশায় পড়িয়া যাহা করিলাম খুবই করিলাম। এখন এই সূতগর্ত্তে যাই কোথা; এ কালসাপকে ফেলি কোথা। বিমলা আমাকে স্নেহ করে, আর আমি যখন তাহারই কন্যা, তাহার কোলে আশ্রয় লইয়া থাকিলে, সে আমার কোন উপায় করিতে পারিবে। না—এ লজ্জার কথা আমি কাহাকেও বলিব না। শিক্ষার কারণে, উহাদের রুচি একধরণের, আমার রুচি অন্য ধরণের হইয়াছে।

উঁহাদের সহিত আমার মনের মিল হইবে না। আমি যেমন গভীর গোপনে, সকল চক্ষু লুকাইয়া, অন্ধকারে বসিয়া বিষ খাইয়াছি; তেমনি গভীর গহনে যাইয়া, অন্ধকারে বসিয়া এ বিষ গোপনে উদ্গীরণ করিব। কাহাকেও কিছু বলিব না। জগৎ ত্যাগ করিব জগৎসিংহকে ভুলিব, ওসমানকে ছাড়িব, কাহারও আশ্রয় লইব না। আমার নাম তাড়কা, আমি চির বিতাড়িতাই থাকিব। আমার অদৃষ্ট অন্ধকারাবৃত আমি অন্ধকার দেশে যাইব।—আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, আমিও সুখ চাহি না। আমি সকলের ত্যজ্যা, জন্মাবধি ত্যজ্যা, আমি ত্যজ্যা হইয়াই থাকিব।

এমন সময়ে ওসমানখাঁ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন। "আয়েশা! আমি তোমাকে কোন কথা বলিতে আসিয়াছি।" আয়েশা ওস্মানের মুখপানে চাহিলেন। ওস্মান বলিতে লাগিলেন। "আয়েশা, আমি তোমার চরিত্রের সমুদায় অবগত আছি। এবং বিবেচনা করি তুমি ফলবতী!—যাহা হউক আমি কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহি না। আমি তোমাকে আর আমার গৃহে স্থান দিতে পারি না এবং তোমাকে স্নেহ করিতাম বলিয়া নিরাশ্রয় জলে ভাসাইতেও চাহি না।—আমার ইচ্ছা তুমি স্থানান্তরে গিয়া বাস কর। আমার নিকট হইতে যখন যাহা চাহিবে, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

আয়েশা সজল নয়না হইয়া উত্তর করিলেন। "আমি চিরকালই আপনার স্নেহের পাত্রী ছিলাম। আমার বুদ্ধির দোষে আজ আমি, আপনার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি আপনার পবিত্র গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত নহি, আমিও এবাড়ী ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি। আপনি আমার প্রতি দয়া করিতে চাহিতেছেন, আমি চিরকাল যখন আপনার দয়া গ্রহণ করিয়াছি; আজ না করিব কেন? আপনি একটি কবর নির্ম্মাণ করিয়া; জীবিতাবস্থায় আমাকে তথায় গোর দিয়া আসুন।—ইহাই আমার শেষ ভিক্ষা। আর কিছু না।"

ওস্মান সজল নয়নে বলিলেন। "আয়েশা আমি তাহাই করিব। তোমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত তুমি নিজ হইতে যাহা স্থির করিয়াছ; যদি করিতে পার তবে তুমি দেবতার ন্যায়, মরিয়াও চিরজীবী হইয়া থাকিবে।—যখন বলিবে, আমি তখনি প্রস্তুত থাকিব।" এই বলিয়া ওস্মান খাঁ চলিয়া গেলেন।

বিমলাও তিলোত্তমাকে লইয়া, বিষাদসিন্ধু সন্তরণ করিতেছেন। আয়েশার মত তাঁহাদেরও নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, আহার বিহার কেশবিন্যাশ নাই; ফুল তুলিয়া

মাল্য গাঁথা আদির রুচি নাই। অবিরত একত্র বসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন এবং নয়নজলে অঞ্চলসিক্ত করিতেছেন। আয়েশা প্রায় নিয়তই এই বৃক্ষতলে বসিতেন। একদিন, একটি কথা জানিবার জন্য মলিনবদনা বিমলা ও তিলোত্তমা, আয়েশার নিকট আসিয়া নীরবে উপবেশন করিলেন।

আয়েশার বাম পার্শ্বে তিলোত্তমা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে বিমলা বসিলেন। সোফার উপর ত্রিজারজা শোভা পাইল। অমনি সেই উৎপন্নবুদ্ধি আয়েশার উদাসীনভাব বিলুপ্ত হইল। তিনি স্বীয় বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া ধীরভাবে বসিলেন। বিমলা আয়েশাকে সুমিষ্ট ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন। "মা, তুমি একাকী বসিয়া কি চিন্তা করিতেছ।" আয়েশা বলিলেন।" আপনাদের মত, আমিও অদৃষ্ট স্রোতে ভাসিতেছি। কিন্তু আমি তো আপনাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।—তবে আপনি কেন জিজ্ঞাসা করেন?—আপনাদের রুচিতে যাহাই হউক, আমাদের রুচি মতে সকল কথা, জিজ্ঞাস্য বা প্রকাশ্য নহে।—কেহ কি কাহাকে আপন মনের কথা বলে?"

বিমলা অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন। "তা' মা! আমি আর ঐ কথা পাড়িব না। অন্য একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব. বলিবে কি?" আয়েশা বলিলেন। "যাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারে; তাহারাই প্রশ্ন না শুনিয়া, সে প্রশ্নের উত্তর করিতে প্রতিশ্রুত হয়।" বিমলা বাক্‌যুদ্ধে কখনও কোথাও পরাভূতা হন নাই; আজ আয়েশার নিকট নতশিরা হইয়া প্রশ্ন প্রকাশ করিলেন। "মা জগৎসিংহ কি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।—তিনি কি খালাস পাইয়াছেন।"

আয়েশা। "আপনার কি বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে?—আমার সহিত জগৎসিংহের যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহার সংবাদ রাখি এবং জানি। কিন্তু আমি তাহা বলিতে পারি কি? আর যদি সম্বন্ধ না থাকে তবে তার কথা জানি না।—যে প্রশ্নের উত্তর কোন দিক হইতে পাইবার সম্ভাবনা নাই।—এমন প্রশ্ন আপনাদিগকেই করিতে দেখি। আপনাদের মনের ধারণা ও অভিরুচি সকল এমন অদ্ভুত রকমের কেন?"

বিমলা। "কেন মা. আমাদের স্বভাবে কি দোষ পাইলে?"

আয়েশা। "জগৎসিংহ আপনাদের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনাদের জন্যই সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া তিন মাসকাল শয্যায় পড়িয়া ছিলেন। —মরিলেন বাঁচিলেন, কি হইলেন আপনারা তাঁহার সংবাদ না রাখিয়া কিরূপ সভ্যতার পরিচয়

দিলেন ?—তাঁহার সেই অবস্থার উপর, ওস্‌মান, আয়েশা, এবং কৎলু খাঁর ন্যায় শত্রুদেরও করুণার উদয় হইল, তাঁহারাও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলেন ; কিন্তু আপনাদের ন্যায় মিত্রকে তিনি একদিনের জন্যও দেখিতে পাইলেন না। তাই বলি, আপনারা তাঁহার বসন্তকালের মিত্র। শীতকালের কেহই ছিলেন না, আবার যেমন ফাল্‌গুন মাসটি পড়িয়াছে, অমনি এক রাত্রি দেখি, তিলোত্তমা তাঁহার দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া আছে।—তাই তিনি, বড়ই মনের দুঃখে, তিলোত্তমাকে বলিয়াছিলেন 'কে বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা!—ফিরিয়া যাও 'পূর্ব্ব-কথা ভুলিয়া যাও!' অর্থাৎ তোমাদের মত লোকের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই।"

তিলোত্তমার যেন চৈতন্যোদয় হইল। তিনি আয়েশার হাত ধরিয়া বলিলেন। "আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, আমি তখন তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারি নাই।"

বিমলা আয়েশার দূরবীক্ষণ ও উৎপন্নবুদ্ধি দেখিয়া হত বুদ্ধি হইলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তর করিবার শক্তি থাকিবার কারণে অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন। "মা, তুমি তো জান, আমরা তখন বন্দিনী হইয়াছিলাম।"

আয়েশার সহ্য হইল না, তিনি বলিয়া ফেলিলেন। "তাই বুঝি বধ্যভূমিতে, স্বাধীন ভাবে যাইতে পারিয়াছিলেন ?—আপনি যে 'মরিবেন' বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; তা মরিলেন না কেন ?—পিতার প্রেমে মুগ্ধা হইলেন কেন ? বলিতে হইলে তোমার সহবাসেই পিতার পীড়া বাড়িয়া গেল।—তুমিই বীরেন্দ্রহন্ত্রী, তুমিই কৎলুহন্ত্রী।"

বিমলা হতজ্ঞান হইলেন। তিনি এবার বুঝিতে পারিলেন যে, আয়েশাকে তিনি কিছুতেই বাক্যে জিনিতে পারিবেন না। আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন। "জগৎ-সিংহ এখন কোথায়, অভিরামস্বামী কি সে কথা বলিতে পারেন না ?"

বিমলা কাতর স্বরে বলিলেন। "মা, তুমি আমার পেটের মেয়ের মত।—মা'কে এমন করিয়া কথা শোনাইতে আছে কি ?"—আয়েশা স্তিমিত নয়নে বিমলার মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন। "আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি মনে মনে আমাকে কতই ধন্যবাদ দিতেছেন। আপনাদের প্রাণে যে 'সত্য কথা' শেলসম বিদ্ধ হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যাঁহারা অলীক বলিয়া, আপনাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করেন, তাঁহারা আপনাদের নিকট ভাল, তাহা আমি বুঝি নাই। যাহা হউক, আর এরূপ বলিব না।"

বিমলা। "মা, তোমাকে যখন মেয়ে বলিয়াছি, তখন বলিতে কি?—জগৎ সিংহ, এই তিলোত্তমার ভাবী স্বামী। তাই তাঁহাকে সাক্ষাৎ দিতে পারি নাই।"

আয়েশা। "তা কে জানে মা!" বিমলা সাহস পাইয়া বলিতে লাগিলেন। "মা, জান তো! মেয়ে মানুষ লজ্জার পুতুল প্রায়। বিবাহের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ করিতে পারে কি? আয়েশা। "আমি জানিতাম না যে, বিবাহের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ করা আপনাদেরও ধর্ম্মে নিষিদ্ধ।" বিমলা। "সকল ধর্ম্মই এক মা,।" আয়েশা। "এক কি করে! আমাদের ধর্ম্মে আমরা বিবাহের পূর্ব্বে বাসর সাজাই না।—আপনাদের ধর্ম্ম, বিবাহের পূর্ব্বে বাসরবাসে অনুমতি দেয়, কিন্তু রুগ্ন শয্যা দর্শনে দেয় না। এইখানটায় যে, আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে মেলে না।" এই বলিয়া বিমলার মুখপানে একপ্রকার রঙ্গবিকাশী নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

বিমলা, লজ্জায় নতনয়না হইয়া রহিলেন। আয়েশাকে আক্রমণ করিবার কোনই পথ পাইলেন না। চতুরা আয়েশা মনে মনে আনন্দিতা হইয়া স্থির করিয়া লইলেন 'আমার গুপ্ত কথার নাম গন্ধও বিমলার জানা নাই। জানা থাকিলে, যেরূপ আক্রমণ করিয়াছি, এতক্ষণ তুফান উড়াইয়া ছাড়িত। বেটী আমার মনের কথা লইতে আসিয়াছে! থাম, এইবার তোমার সমাজ এবং ধর্ম্মের অবস্থা জানিব, ভাল হয় তো তোমাকে মা বলিয়া, তোমারই নিকট থাকিব।' পরন্তু প্রকাশ করিয়া বলিলেন। "আপনি যাহা করিয়াছেন, অবশ্য তাহা শাস্ত্র মতেই করিয়াছেন। তখন আপনাদের তায় পাপ নাই। যদিই পাপ থাকে তাহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের শিরেই পড়িবে।—কেমন কি না?"

বিমলা। "মা তুমি ঠিক বলিয়াছ!—আমাদের শাস্ত্রই আমাদের গলার পাপ হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রীরাই আমাদের ধর্ম্মটীকে মোচাকলার ঘণ্ট করিয়া তুলিয়াছে। মাগো কি আর বলিব!—আমাদের জাত কুল কিছুই রাখে নাই। রমণীরা যেন হিন্দু সমাজের খেলনা পুতুল। (ইহা বর্ত্তমানের ধারণা।)

আয়েশা। "থাক, বেদ পুরাণ শাস্ত্রের কথা!—আপনি আমাকে কন্যা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন কেন?—আপনি কি আমার মা হইবেন?" বিমলা। "মাগো, তুমি যদি একটিবার আমাকে মা বলিয়া ডাক, আমার জীবন সার্থক হয়। আমি মর্ত্তে বসিয়া স্বর্গ পাই। মাগো, তোমাকে কি আর বলিব। কেবল তোমার 'মা' শব্দ শুনিবার লালসায়, আমি কৎলুখাঁকে স্বামীত্বে গ্রহণ করিতে এতদূর বিহ্বল

হইয়া ছিলাম যে, বীরেন্দ্রসিংহের ছিন্ন মস্তকও আমার চক্ষে জল আনাইতে পারে নাই। নৈলে, পতিহন্তার পদ সেবা, এ বয়সে স্বামী করা,—এ সকল আর আমায় সাজে কি মা?—কিন্তু আমার অদৃষ্ট এমনি মন্দ যে, আমি এত করিয়াও তোমার 'মা' হইতে পারিলাম না। আমার সকল সাধে বাদ পড়িল।" এই বলিয়া আয়েশার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আয়েশা বলিলেন। "আমি শুনিয়াছি, আপনি কখনই ফলবতী হন নাই। তাই ভাবি, আপনি হয় তো সন্তানের মায়া জানেন না?" বিমলা এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন। "মা, আমারও এক কন্যা জন্মিয়াছিল, থাকিলে তোমারই বর্ণ ও বয়সের হইত।" আয়েশা। "সে কন্যা কি হইল?" বিমলা, আবার চক্ষুদ্বয় জলে ভাসাইয়া বলিলেন। "মা, তাকে ছেলে ধরায় নিয়ে গেছে। দেখিতে অবিকল তোমার মত ছিল। তাই মা, তোমার জন্য আমি উদাসিনীর মত হইয়াছি।"

আয়েশা। "সে মেয়ে কি বীরেন্দ্রসিংহের?"

বিমলা ভাবিলেন। 'এর কাছে, কথা গোপন করিয়া, শেষে লজ্জা ক্রয় করা অপেক্ষা, যথাযথ খুলিয়া বলাই ভাল।' পরন্তু প্রকাশ করিয়া বলিলেন। "মা!—তোমার নিকট কোন্ কথাটাই গোপন করিতে পারিলাম যে, এটা গোপন করিতে পারিব।—মা, সে কন্যা বীরেন্দ্রসিংহের অথবা মানসিংহের, সে কথা আমি সঠিক বলিতে পারিব না। তখন আমি মানসিংহের উপপত্নী ছিলাম; কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহও গোপনে আমার নিকট যাতায়াত করিত।" আয়েশা। "সেই বই, আর কি আপনার পুত্রকন্যা হয় নাই।" বি। "বীরেন্দ্র আমার সে পথে কণ্টক দিয়াছিল।"

আয়েশা। "আপনি জগৎসিংহকে লিখিয়াছেন। 'আমি তোমার পিতৃভবনে অনেক দিন পৌরস্ত্রী হইয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে চেননা, তুমি তখন দশম বর্ষীয় বালক ছিলে।' এ কথার অর্থ কি?" বিমলা। "মা, আমি কুমারকে প্রতারিত করিয়াছিলাম। মহারাজ আমাকে স্বতন্ত্র ভবনে রাখিয়াছিলেন। অন্তঃপুরে রাখিলে জগৎসিংহ আমাকে চিনিতে পারিত না কি? জগৎসিংহ আমার সম্মুখ দিয়া দুইবেলা পড়িতে যাইত, আমি তাকে জানালা দিয়া দেখিতাম। তাই তাকে আমি চিনি সে আমায় চেনে না।"

আয়েশা তাঁহার অপার কৌশলমন্ত্রে, বিমলার সমুদায় গুপ্তকথা বাহির করিয়া লইয়া, পরিশেষে বলিলেন। "তা, আমি যদি আপনার সেই কন্যাই হই, আমাকে

গ্রহণ করিবেন কি?' বিমলা। "মাগো, আমি তোমাকে অন্তরের প্রধান অংশে স্থান দিয়া রাখিব।" আয়েশা। "আমারও মা নাই, আপনাকে মা বলিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত বল প্রকাশ করিতেছে।—তবে কিনা, আপনাদের কন্যা-পালন-প্রণালী গুলি, আমার ভাল লাগে না।" বি। "কেন মা, আমরা কি মেয়েকে মন্দ শিক্ষা দিই?" আয়েশা। "মন্দ কেন, ভালই বলিতে হইবে। আপনাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী এমন সুন্দর যে, আপনাদের কন্যারা কটাক্ষে কথা বলিতে পারে।" বিমলা। "সে কি মা, আমরা কি আপন কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তি শিখাই নাকি?—মা হইয়া মেয়েকে মন্দপথ দেখান সম্ভব কি?"

আয়েশা। "তবে, কেমন করিয়া, শৈলেশ্বর দুর্গমধ্যে, তিলোত্তমা, জগৎ-সিংহকে এতদূর কাবু করিয়া ফেলিল যে, তাহাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ একাকী বাসর গৃহমধ্যে হইল? এবং দুই চারি সাক্ষাতের পরই, কুমার আপনাদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন।—আমিও যদি আপনাদের হাতের প্রতিপালিতা হইতাম, তাহা হইলে, আমি যতদিন ধরিয়া কুমার জগৎসিংহের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলাম, আজ যদি আমাকে ফলবতী দেখিতেন, আপনি বিস্মিত হইতেন কি?" বিমলা। "মা, তুমি নিখুঁত সতী।—তিলোত্তমায় খুঁত আছে। তাই ওকে ঠেলিয়া পার করিতে হইতেছে।"

আয়েশা বলিলেন। "আমি ঠেলিয়া পার করিবার পক্ষপাতী নহি। আমি আপনাকে 'মা' বলিয়া আপনার সেই জারজা কন্যার স্থলে,আপনার আশ্রয়ে থাকিতে পারি, যদি আপনি আমার নির্ব্বাচন মতে, আমার ও তিলোত্তমার বিবাহ দেন।"

বিমলা। "তুমি তোমার রুচি মত বিবাহ কর, তিলোত্তমা তার রুচি মত বিবাহ করুক।—তা' তোমার কি অভিরুচি তাহা তিলোত্তমাকে খুলিয়া বল, তাতে তিলোত্তমা স্বীকার করিলেও করিতে পারে।"

আয়েশা। "রহিম খাঁ নামে একজন রক্ষী এই বাড়ীতে আছে। তার দুইটী জারজ পুত্র আছে, তাহারা এক বাগ্দিনীর গর্ভজাত হইলেও, উচ্চবংশীয় রমণীর কামনা করিতেছে।—আমরা ভগিনীদ্বয় তাহাদেরই উপযুক্ত পাত্রী নহি কি?"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন। "ওস্‌মান খাঁ যে রাত্রি আমাকে বন্দি করিয়া, যে রহিম খাঁয়ের রক্ষণাবেক্ষণায় রাখিয়াছিলেন, এ ব্যক্তি সেই নাকি?'

আয়েশা। "হাঁ সেই, যাকে আপনি অলীক প্রেমের প্রলোভন দেখাইয়া স্বকীয় কররজ্জু মোচন করাইতে পারিয়াছিলেন!"

তিলোত্তমা থাকিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন। "ভগিনী, আপনার নির্ব্বাচন এমন নীচ কেন?" আয়েশা প্রখর লোচনে তিলোত্তমার দিকে চাহিয়া বলিলেন। "সৌরভশূন্য শিমূলফুল রাজবাসর সাজাইতে যায়, অথবা বাদুড়প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে?" তিলোত্তমা আর উত্তর করিতে পারিলেন না। আয়েশা বলিতে লাগিলেন। "যদি কোন দুষ্টমালী রাজোদ্যানে একটিমাত্র কণ্টকতরু বপন করে, সে কি সমস্ত কাননটা কণ্টকময় করে না?—এরূপ করা কি পরম অধর্ম্ম ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক নহে?" তিলোত্তমা নিরুত্তর, আয়েশা বলিতে লাগিলেন।—"ইচ্ছা করিলে, কুমার জগৎসিংহের আকাঙ্খা স্রোত, আমি কি ফিরাইয়া লইতে পারিতাম না।—কিন্তু তাতে কৎলুখাঁর পবিত্র পালঙ্ক গোবরময় করা হইত, তাই আমি তাহা পরম অধর্ম্ম ও পিশাচিনীর কার্য্য মনে করিয়া, করিলাম না।—ভগিনী, বোধ করি, আমার নয়নবাণ, তোমার অপেক্ষা হীন তীক্ষ্ণ ও স্বল্প বিষপ্রসবিনী না হইবে। তবে অমন সুযোগ পাইয়াও সে বাণ হানিলাম না কেন?—কেবল ঈশ্বর ভয়ে।" তিলোত্তমা নিরুত্তর, আয়েশা বলিতে লাগিলেন। "আমার ঈশ্বর ভয় উদয় হয়, তোমাদের হয় না কেন? অথবা তোমরা ঈশ্বরকে ভয় কর না, আমি করি কেন?—ভগিনী! উহা তোমাদের সমাজের শিক্ষার গুণ। আমি যদি সত্যসত্যই বিমলামাতার কন্যা হইতাম, আর উহার হাতে আমার প্রতিপালন হইত; তাহা হইলে, আজ জগৎসিংহকে লইয়া ভগ্নীদ্বয়ের মধ্যে কিরূপ দ্বন্দ্ব বাধিত,—ভগিনী! তাহা অনুমান করিতে পার কি?" তিলোত্তমা নিরুত্তর রহিলেন। (আয়েশার সাফাইর সাক্ষী কেমন হইল?)

বিমলা এতক্ষণে একটি আনন্দের সংবাদ এই পাইলেন যে, 'আয়েশা জগৎসিংহের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহে'। আয়েশা দুইজন মহা প্রতারককে প্রতারিত করিলেন। দুইজন মহাঠককে ঠকাইলেন। পাঠক! আয়েশার চাতুরী ও ঠকবাজী, তিলোত্তমা ও বিমলাকে ছাপাইয়া উঠিল কেন, তাহা বুঝিতে পারেন কি? আয়েশা যে দ্বি-ঔরসজাতা রাজকন্যা, তাই, বিমলা ও তিলোত্তমা তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না।

চতুরা বিমলা স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধ্যর্থ আয়েশাকে সম্বোধন করিয়া "সৌব সমাজের

নিন্দা করিতে লাগিলেন। "মা, আমাদের সমাজের কথা ছাড়িয়া দাও।—আমাদের নীচ হইয়া উচ্চাভিরুচির কথা জগতে অবিদিত নহে। আমরা কল্পনায় টিকটিকিকে হাতি বলি, ছুঁচাকে মহাবীর সাজাই, আর আর্শোলাদলকে জলে চিৎকরিয়া ফেলিয়া মহারাজার সৈন্যপূর্ণ রণতরী বলিয়া দেখাই। আমাদিগের মধ্যে রাজোত্থান কোথা মা!—আমাদের মধ্যে লম্পট শ্রেষ্ঠ হইলে, অভিরামস্বামীর ন্যায় দেবতা হয়। অর্দ্ধ-জারজা হইলে, তিলোত্তমার মত দুর্গেশনন্দিনী হয়। কুলটা শ্রেষ্ঠ হইলে, দেবীচৌধুরাণী হয়। আর ডাকাত শ্রেষ্ঠা হইলে, রাজা সত্যানন্দ ঠাকুর হয়; প্রতারক লেখক হইলে সাহিত্য সম্রাট হইয়া যায়।—মা! তুমি আমাদের সমাজের অদ্ভুত অভিনয়ের কথা ছাড়িয়া দাও।—তিলোত্তমা যাহাতে জগৎসিংহকে পায়, তাহা করিয়া দাও।"

আয়েশা। "তবে, তাহাই হউক।" বিমলা। "তোমার বিনা চেষ্টা ও বিনা সাহায্যে, তিলোত্তমার বিবাহ হওয়া কঠিন।" আয়েশা চিন্তা করিয়া বলিলেন। "যখন ভগিনী বলিয়াছি তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কুমার জগৎসিংহের অনু-সন্ধান করুন।—আমিই দাঁড়াইয়া তিলোত্তমার বিবাহ দিব।"

কিছুদিনের মধ্যে একদিন অভিরামস্বামী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, 'জগৎ-সিংহ তিলোত্তমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তোমরা তিলোত্তমাকে যথারীতি সাজাইয়া, অমুক তারিখে, অমুক স্থলের অমুক বৃক্ষতলে যাইয়া উপস্থিত থাকিবে।' এই শুভ সংবাদ পাইয়া বিমলা এবং আয়েশা, তিলোত্তমার শুভ-বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। (বিবাহটা ঘর থাকিতে বনে কেন?)

আয়েশা তাঁহার অলঙ্কার দিয়া তিলোত্তমাকে উত্তমরূপে সাজাইয়া; তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া, ওস্‌মান খাঁয়ের নিকট গেলেন। এবং তাঁহার নিকট তাঁহাদের সমুদায় মনের বাসনা বিবৃত করিয়া কহিলেন। পরিশেষে বলিলেন, "এই সঙ্গে আমিও আপনার বাড়ী হইতে বিদায় হইতেছি। আমি আপনার নিকট যে দয়ার প্রার্থী হইয়াছিলাম, এবং আমার প্রতি যে দয়া দেখাইতে আপনি স্বীকৃত হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে পত্র এবং ফর্দ্দদ্বারা, আমার অভাব নিবেদন ও জ্ঞাপন করিব;" এই বলিয়া আয়েশা, সজল নয়নে ওস্‌মানের পদচুম্বন করিয়া স্বীয় দোষ-গুণের ক্ষমার প্রার্থিনী হইলেন এবং চিরকালের জন্য বিদায় চাহিলেন।

আয়েশাকে যতই নিকৃষ্ট মনে করুন, সে সময়ে তাঁহাকে বিদায় দিতে ওসমানের নয়নেও জল দেখা দিল। তিনি নয়নজল মোচন করিয়া বলিলেন। "আমার নিকট

হইতে তুমি যখন যাহা যাচ্ঞা করিবে তখনি তাহা পাইবে।—তবে প্রকাশ্যরূপে আমি তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিব না।" এই বলিয়া, ওস্‌মান তাঁহাদের তিন জনকেই বিদায় দিলেন। যাইবার সময় ওস্‌মান আয়েশাকে কিছু অর্থ গোপনে দান করিলেন।

তাঁহারা তিনজনেই গড়মান্দারণের পথাবলম্বন করিয়া চলিলেন। শৈলেশ্বরের দুর্গপার্শ্বে এক বটবৃক্ষতলে, কুমার জগৎসিংহ এবং অভিরামস্বামী দাঁড়াইয়াছিলেন। (সেই courtshipএর গির্জ্জাতেই এই বিবাহ হইবে।) সেই স্থলে পৌঁছিয়া; আয়েশা তিলোত্তমাকে, কুমার জগৎসিংহের করে সমর্পণ করিয়া দিলেন; এবং আশীর্ব্বাদচ্ছলে, নিরশ্রু নয়নে বলিতে লাগিলেন। "এই রত্ন দিলাম, আমার অলঙ্কার দিলাম। এই সুন্দরীতে দুইপ্রকার সৌন্দর্য্য রহিল। তিলোত্তমার রূপ-রাশি এবং আয়েশার ভূষা-প্রতিভা।—আয়েশার সকল আশা পূর্ণ হইল। আয়েশার সংবাদ পাইবেন, কিন্তু আর তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন না। আয়েশা অদ্য হইতে জগৎ পরিত্যাগ করিল। আয়েশা সকলকে দেখিবে কিন্তু আয়েশাকে কেহ দেখিতে পাইবে না।—আয়েশা মরিবে না বাঁচিবেও না।—আয়েশা আপনার ভগিনী।" এই বলিয়া আয়েশা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্যা হইলেন। জগৎসিংহ তাঁহাকে কিছু বলিবেন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার সে মনের কথা মনেই রহিয়া গেল।

১২ ✻ আয়েশার পরিণাম। ✻ ১২

শ্রীরামপুর মহকুমার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে, দামোদর নদীর নিকটবর্ত্তী গৌরীবাটী নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের চতুর্দ্দিকে, ভঞ্জপুর, গরিয়া, তৈবরী, নারায়ণ-পুর, এবং কোত্রাদি আরও অনেকগুলি গণ্ডগ্রাম দেখা যায়। গৌরীবাটী গ্রামে গৌরীশঙ্কর নামে এক মাতৃপিতৃহীন যুবক বাস করিতেন। তাঁহার মাতা তাঁহার জন্য অনেক ধন রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীখানিও অতি সুন্দর, বাড়ীতে দাসদাসী রাখাল চাকরও অনেক ছিল। গৌরীশঙ্কর, রূপেগুণে ব্যবহারে দানে ধ্যানে লৌকিক আচারে ও মুখমিষ্টতা প্রভৃতিতে দশবিশখানি গ্রামের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। এত অধিক জ্ঞান গুণ থাকিতেও, কেহ তাঁহাকে কন্যা দান করিতে স্বীকার করিতেন না। গৌরীশঙ্করের রূপবতী মাতা তাহাকে কোলে করিয়া এই

গ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। ৫।৬ বৎসর পর আবার সেই বিধবাসুন্দরী গর্ভবতী হন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই কারণে দেশের লোক গৌরীকে মনে মনে নিন্দা করিতেন।

গৌরীশঙ্কর আপন গৌরব রাখিয়া সর্ব্বথা বলিয়া বেড়াইতেন যে, তাঁহার মাতা দেবী ছিলেন। তিনি দেবপুত্র, দেবকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি ধরা-বাসিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহেন। লোকে তাঁহার অন্যান্য সকল কথা বিশ্বাস করিলেও এ কথাটি বিশ্বাস করিতেন না।

গৌরীশঙ্করের কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল, তন্মধ্যে একটি গাভী সহসা দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দেয়। তিনি রাখালের উপর পীড়ন করেন 'তুই মাঠে গিয়া গাছ-তলায় ঘুমাস্, কেহ এই গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়।'

এইরূপে পীড়িত হইয়া, পরদিবস সে রাখাল বৃক্ষতলে নিদ্রা না যাইয়া, শয়ন করিবার ভাণে পড়িয়া রহিল। দেখিল, সেই গাভী পাল ছাড়িয়া, অনতিদূরবর্ত্তী এক বনবহুল ভূখণ্ডে প্রবেশ করিল। রাখাল অন্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। গাভী সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তথাকার এক উচ্চভূমির উপর আরোহণ করিয়া, তথাস্থিত এক দীর্ঘাকার শিলাখণ্ডের উপর শয়ন করিল। এবং কতক্ষণ শয়ন করিয়া, তথা হইতে উঠিয়া, আপন পালের দিকে মুখ করিল। রাখাল দেখিল আর তাহার বাঁটে দুগ্ধ নাই।

রাখাল এই কথা গৌরীশঙ্করের নিকট আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলে, পরদিবস যথা সময়ে তিনি সেই বনমধ্যে গমন করিলেন। বনের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া সেই উচ্চভূমির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই ভূমির পরিধি প্রায় দেড় শত হাত হইবে। তাহার মধ্যভাগে একখণ্ড শিলা পড়িয়া আছে। সেই শিলার পশ্চিম প্রান্তে, সুমার্জ্জিত পিত্তলপাত্রে একসের পরিমাণ ভিজা ছোলা রাখা রহিয়াছে। কিন্তু জনপ্রাণী কেহই নাই। তিনি একটি বৃক্ষশাখায় উঠিয়া, বসিয়া রহিলেন। যথা সময়ে তাঁহার সেই গাভী, সেই বনে প্রবেশ করিল। এবং সেই শিলাখণ্ডের উপর শয়ন করিয়া ছোলা খাইতে লাগিল; এবং ছোলাগুলির শেষ করিয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল। গৌরীশঙ্কর বুঝিলেন, 'সেই প্রস্তর খণ্ড তাঁহার গাভীর দুগ্ধ শোষণ করিয়া লয়, এবং স্থলটি নিশ্চয়ই দেবাশ্রিত।'

গৌরীশঙ্কর বৃক্ষ হইতে নামিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমনি কোথা

হইতে শব্দ হইল। "দেবলীলা দর্শন করিলে, আর কেন বাড়ী যাও।" এই শব্দ বার বার তিনবার হইল। তখন তিনি সাহস করিয়া বলিলেন। "আমি দেব দর্শনে আসিয়াছি। আমার প্রতি দেবতার দয়ার উদয় হউক।" অমনি এক ঋষিবর সেই প্রস্তর খণ্ড ফুটিয়া, মোমের বাতীর ন্যায় বনদেশ উজ্জ্বল করিয়া প্রস্তরের উপর দাঁড়াইলেন। গৌরীশঙ্কর স্তিমিত নয়নে কতক্ষণ সেই দেবতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে যুক্তকরে অবনত মস্তক হইয়া প্রণাম করিলেন।

গৌরীশঙ্করের রূপরাশি ও যৌবন ঋষিবরের নয়নপ্রান্তে গাঁথিয়া গেল, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "তোমার অভিপ্রায় কি?" গৌরী। "দেব, আমার ইহজগতে কেহই নাই—" ঋষিবর। "গৌরী! তোমার সকলই আছে।—তোমার জননী সন্ন্যাসিনী ছিলেন, তাঁহার কাহিনী অতি অপরূপ, তুমি লোকালয়ে নিন্দার পাত্র হইয়া থাকিও না।"

গৌরী। "আমার প্রতি যে আদেশ হইবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।" এমন সময়ে এক দুগ্ধ পোষ্য শিশুর ক্রন্দন শব্দ কর্ণগোচর হইল। ঋষিবর বলিলেন। "আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, তুমি এই স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে কি? পার তো থাক।" এই বলিয়া তিনি কলের প্রতিমার ন্যায় ধরাগর্ভে নামিয়া গেলেন। শিলাখণ্ড যেমন ছিল তেমনি রহিল।

গৌরীশঙ্কর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল, অন্ধকার রজনী আইল। সমস্ত রজনী অসংখ্য ডাঁশমশার মধ্যে দাঁড়াইয়া কাটিল, ঋষিবর আর ফিরিলেন না। বেলা এক প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর, যখন তৃতীয় প্রহর হইল; এক দাসীরূপী সন্ন্যাসিনী; সেইরূপে সেই শিলা বিদীর্ণ করিয়া উপরে আসিল। তাহার হস্তে সেই পিতলপাত্রে ভিজা ছোলা। সে যথাস্থলে সেই পাত্র রাখিয়া, যুবককে জিজ্ঞাসা করিল। "তুমি এখানে কে গা?—কেন দাঁড়াইয়া আছ। তুমি যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছ, তিনি কল্যই যোগসাধনার্থ হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন। এখন ছয় মাস আসিবেন না। তুমি দাঁড়াইয়া কি করিবে। বাড়ী যাও।"

গৌরী দৃঢ়চিত্তে উত্তর করিলেন। "যত দিনেই আসুন, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিব না।" যোগিনী আর কিছু না বলিয়া ধরাগর্ভে অবতীর্ণা হইল। গৌরীশঙ্কর পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার গাভী আসিল সেইরূপে প্রস্তরোপরি শয়ন করিয়া ছোলা খাইয়া চলিয়া গেল। আবার সন্ধ্যা আসিল রাত্রি হইল, গৌরীশঙ্কর

ক্ষুৎ-পিপাসার অস্থিরতা দমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর তখন, কে যেন তাঁহার কর্ণমূলে দাঁড়াইয়া এক অভূতপূর্ব্ব স্বরে বলিলেন। "গৌরী! আমি এখন হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছি। তিন বৎসরকাল এখানে থাকিব, তুমি কি করিবে?" গৌরী চমৎকৃত হইয়া চারিদিক চাহিলেন, কেহ কোথাও নাই।' তিনি সাহস করিয়া উত্তর করিলেন। "আমি আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিব।—আমি তিন বৎসর যাবৎ এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিব।"

দৈববাণী। "দাঁড়াইয়া থাকায় পুণ্য নাই।—এই তিন বৎসরকাল তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট বসিয়া, তাহার আদেশানুসারে যোগাভ্যাস কর।" গৌরী। "তাহাই করিব! তবে, আমার স্ত্রী নাই, আমি অবিবাহিত।" দৈববাণী। "তুমি বিবাহিত তোমার স্ত্রীপুত্র সকলই আছে।—তোমার গাভীটি কি অন্য পরকে দুগ্ধ-দান্ করিতে এই বনে আসে?—যদি যোগাভ্যাস করিতে চাও, তবে শিলা খণ্ডের উপর আসিয়া দাঁড়াও।"

গৌরীশঙ্কর কৌতুহল-পরবশ হইয়া শিলাখণ্ডের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ পাতালদেশে প্রবিষ্ট হইয়া গেলেন। সেখানে ঘোর অন্ধকার। নীচে নামিতেই, কে তাঁহার হাত ধরিয়া, সেখান হইতে অন্যস্থানে লইয়া গেলেন। এবং তথায় তাঁহাকে এক পালঙ্কের উপর বসাইয়া, অগ্নি করিয়া এক সুন্দর শামাদান জ্বালাইলেন। গৌরীশঙ্কর দেখিলেন, গৃহখানি যেন একটি ক্ষুদ্র রাজভবন। কাষ্ঠ নির্ম্মিত রংকরা গৃহখানিতে ৮ × ৫ হাত তিনটি কামরা, এবং ১৫ × ৬ একটি হল এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুদাম আছে। কলিকাতার আধুনিক আবাসের মত, তাহার ভিতর, জলের কল, ড্রেন এবং পাইখানাদি আছে। পালঙ্কটীর উপর শাহা তোষক ও মখমলের বালিশ শোভা পাইতেছে। এবং তাহার উপর এক দেবপুত্রের ন্যায় পুষ্টকায় সুন্দর শিশু শয়ন করিয়া আছে। এবং যিনি তাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন, তিনি এক দেবকন্যারূপিনী নারীরত্ন।—তেমন রূপ, তেমন অবয়ব, তেমন গঠন, তেমন নাক চোখ, ভ্রূ, ওষ্ঠ, দশন, কেশ, কণ্ঠাদি, গৌরী কখন স্বপ্নেও দেখেন নাই। তিনি প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ নয়নে সেই রূপসীর রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবতীও দুই একবার তাঁহার দিকে চাহুনী ফেলিলেন।

যুবতী, যুবকের জন্য সামান্য আহার্য্য সামগ্রী আনিয়া দিলেন। যুবক আহারাদি

করিয়া, নিদ্রাতুর হইয়া পড়িলেন। যুবতী তাঁহাকে সেই পালঙ্কে শয়ন করাইয়া, পুত্রকে মধ্যস্থলে রাখিয়া আপনি অপর পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

পরদিবস বেলা এক প্রহরের সময় গৌরীশঙ্করের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই বনের নিকটবর্ত্তী একটি পুষ্করিণী ছিল, তাহা এখনও তথায় আছে। গৌরীশঙ্কর সেই পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। যুবতী তাঁহার জন্য অন্নাদি পাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আসিতেই, দুইজনে একাসনে বসিয়া আহার করিলেন।

আহারাদির পর যুবতী সেই পুত্রটিকে কোলে করিয়া বসিলেন। গৌরীশঙ্কর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "এই পুত্র কাহার?" যুবতী বলিলেন। "বাবা কি সে কথা আপনাকে বলেন নাই?" গৌরী। "ঋষিবর কি, আপনার পিতা হন।" যুবতী। "কেবল আমার কেন, আপনারও হন।—তাঁহার নাম তাড়কনাথ শঙ্করাচার্য্য আর এই পুত্রটি আপনার।"

গৌরী অবাক হইয়া বলিলেন। "এ পুত্র, আমার কেমন করিয়া? এ পুত্র কাহার গর্ভজাত?" যুবতী। "আপনার ঔরসে এ পুত্র আমার গর্ভে জন্মিয়াছে।—বাবা এর নাম রাখিয়াছেন তাড়ক। আমার নাম তাড়কা।—আমি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী। আমি আপনাকে চিনি, আপনি আমাকে চেনেন না?"

এখন আমায় চিন্‌বে কেন ওহে আমার প্রাণের পতি!
বদন চুমে এই কুসুমে বস্‌তে নাকি প্রেম পাতি।
বিমান যানে স্বপ্নে উড়ে—কে বসিত আমায় জুড়ে,
কে হে তিনি বাস্‌তো যিনি আমায় ভাল সারা রাতি।
এই যে শিশু শশীর কণা—এ ছেলেটি তোমার কিনা?
আপন পুতে চিন্তে নার, একি তোমার মনের গতি!
তপের ফলে আমার মাতা—ছিল তোমার জন্ম দাতা,
তোমার মাতা আমার পিতা; আমরা যুগল জায়াপতি?

এই বলিয়া গৌরীর আদি কাহিনী বিবৃত করিলেন। গৌরী উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া তাড়কার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন। 'এমন

লাবন্যময়ী দেবকন্যা; ইহার কথা কি মিথ্যা হইতে পারে?' প্রকাশ্যে বলিলেন। "কথা সকল আমাকে বিস্তৃত করিয়া বুঝাইয়া বলুন।"

তাড়কা বলিতে লাগিলেন। "সরলা এবং চঞ্চলা নামে দুইটি রমণী তাড়ক ঠাকুরের শিষ্যা ছিলেন। তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিতেন। উভয়ের মধ্যে অবিরত মনোমালিন্য হইত। একদিন তাড়ক ঠাকুর দুইটি প্রতিমা গড়িলেন, একটির নাম, তাড়কা এবং অপরটির নাম গৌরীশঙ্কর রাখিলেন। এবং দুইজনকে সেই দুইটি পুতুল দিয়া, পুতুল দ্বয়ের বিবাহ দিলেন। এবং তাহার পর সরলা এবং চঞ্চলাকে বর কনে সাজাইয়া, তাঁদেরও বিবাহ দিলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষের ন্যায় একত্র শয়ন করিতে লাগিলেন। চঞ্চলার গর্ব্ভে তুমি এবং সরলার গর্ব্ভে আমি জন্মিলাম। আমাদের জন্ম স্ত্রীবীর্য্য হইতে। তুমি জন্মিবার পর, আমার মাতার সহিত কলহ করিয়া তোমার মাতা পলায়ন করিলেন। ছয় বৎসর পর, একরাত্রি তাড়ক ঠাকুর আমার মাতাকে লইয়া, তোমার মাতার নিকট গোপনে শয়ন করাইয়া দেন। তাহাতে দুইজনেই গর্ব্ভবতী হন।" গৌরী শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

তাড়কা বলিতে লাগিলেন। "তোমার মাতা, তাড়ক ঠাকুরের অবাধ্য হইয়া ছিলেন বলিয়া, ঠাকুর তাঁহাকে লোকালয়ে ঐরূপে ঘৃণার ভাজন করিলেন। তিনি সেই জন্য আত্মঘাতিনী হন।" গৌরীশঙ্কর সেই লাবণ্যময়ীর সকল কথাই বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। 'যাহার এত রূপ সে যদি মিথ্যা বলিবে, তবে জগতে আর সত্য বলিবে কে?' জিজ্ঞাসা করিলেন। "তা আমার বীর্য্যে তাড়কের জন্ম হইল, অথচ আমি জানিলাম না, সে কেমন কথা?" তাড়কা বলিতে লাগিলেন। সরলার গর্ভে আমি জন্মিলাম। আমার মা আমাকে তিন বৎসরের রাখিয়া জীবন ত্যাগ করেন। ঠাকুর আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার বয়স ১৮ বৎসর হইলে, তোমার সহিত আমার সহবাস হয়। তাতেই এই পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।"

গৌরী জিজ্ঞাসা করিলেন। "সেই অপরূপ সহবাসটা কি প্রণালীতে হইয়াছিল, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দাও!"

তাড়কা। "তুমি স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, স্বপ্নে কখনও শূন্যমার্গে উড়িয়াছিলে কি না?" গৌরী। "হাঁ উড়িয়াছি! অনেকবার উড়িয়াছি।—যেন আমি, কি এক মহাশক্তি পাইয়া উড়িয়াছি।" তাড়কা। "সেই মহাশক্তি ঐ ঠাকুরের। তিনি তোমাকে উড়াইয়া আমার নিকট লইয়া যাইতেন।—আর একটা কথা মনে

করিয়া দেখ দেখি; স্বপ্নে কখন তোমার বীর্য্যপাত হইয়াছিল কি না!" গৌরী বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন। "হাঁ হইয়াছে!—অনেকবার হইয়াছে।" তাড়কা অমনি সেই পুত্রকে তাঁহার কোলে তুলিয়া দিয়া বলিলেন। "এই তোমার সেই বীর্য্য, গ্রহণ কর।"

গৌরীশঙ্কর সেই পুত্রটিকে কোলে লইয়া, আহ্লাদিত অন্তরে তাহার কোমল গালে চুম্বন করিলেন।—তাড়ক হাসিয়া 'ঝে' বলিয়া তাঁহার গাল খামচাইয়া ধরিল। (গৌরী শঙ্করের বুদ্ধিটা অবিকল নভেল ঠাকুরের মত ছিল, সেই জন্য তিনি এই অলৌকিক রূপবতীর মুখে শুনিয়া তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর দেবী বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার কথা গুলি নিঃসন্দেহ চিত্তে বিশ্বাস করিয়া লইলেন। তিনি যে রমণীবীর্য্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সত্য; হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া দেবতা, আর তিনি শ্রীরামপুর মহকুমায়, প্রশ্নোত্তর হইল, তাহা সত্য; তিনি স্বপ্নে উড়িয়া স্ত্রী সহবাস করিয়াছিলেন তাহা সত্য; স্বপ্নে তাঁহার বীর্য্যপাত হইয়া সন্তান জন্মিয়াছে তাহা সত্য; এবং রূপবতী তাড়কা যাহা যাহা বলিয়াছেন, সব সত্য। তিনি অন্তরের মধ্যস্থল হইতে বিশ্বাস করিয়া লইলেন যে, রূপসী তাঁহার বিবাহিতা ভার্য্যা এবং ছেলেটি তাহার ঔরসজাত পুত্র।—পরন্তু তথায় তিনি সেই স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সামান্য দিন যোগাভ্যাস করিতেই, সমুদয় কথার অনুশীলন করিয়া লইলেন।—গাভী আসিয়া, প্রস্তরের উপর শয়ন করিলে, গৌরীশঙ্কর নিজেই, সেই কৌশলসম্পন্ন শিলার নিম্নদেশে দাঁড়াইয়া তাহার এক চক্রাকার ডালা খুলিয়া দিতেন। অমনি গাভীর স্তন তাহার হাতের উপর ঝুলিয়া পড়িত; তিনি দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়া আবার সেই প্রস্তরের ডালা বন্ধ করিয়া দিতেন। সেই আবাসে বিস্তর আশ্চর্য্যক্রিয়াপ্রদর্শী যন্ত্র ছিল, গৌরী সে সকলের ব্যবহার করিতে শীঘ্রই শিক্ষা করিয়া লইলেন। একটি এক শত হাত রজ্জুর মত লম্বা নল ছিল, সেই নলের প্রতি প্রান্ত ভাগ 'কলিকা' আকার। একশত হাত দূরে দাঁড়াইয়া এক প্রান্তের কলিকায় মুখ রাখিয়া কথা কহিলে, অপর প্রান্তের কলিকার নিকটবর্ত্তী লোকেরা সেই কথা শুনিতে পাইত। গৌরীশঙ্কর গভীর নিশায় সেই নল লইয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া, ভদ্র লোকের আবাসে আবাসে সেই কলিকা যোগে উপদেশসহ আকাশবাণী শোনাইতেন। "বনের মধ্যে দেবতা আছে। তোমরা প্রস্তরের উপর দুগ্ধ ঢালিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে।" এইরূপ করিতে অল্পদিনের

মধ্যে সেই বনমধ্যে সেই দেবতা জাগিয়া উঠিলেন। দুগ্ধের ঘটী বাটী লইয়া চতুর্দ্দিক হইতে নর নারী আসিয়া ঐ দেবতার পূজা করিতে লাগিল। কতক দিনের পর এক রাজকুমার বহু সৈন্যসহ নবজাগ্রত দেবতার দর্শনে যান। দেবী তাঁহার পূজা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহাকে দৈববাণী হইল।—"জগৎসিংহ, তুমি যাও!— সুস্থ শরীরে এখানে আসিও না; রুগ্ন শরীরে আসিও।" আবার কতদিন পর এক নবাব, অনেক চাল, দাল, আলু ঘৃত আদি বিবিধ প্রকার আহার্য্যসামগ্রী এবং ব্যবহার্য্য দ্রব্য লইয়া সেই দেবীর পূজা দিয়া ছিলেন। দেবী তাঁহার পূজা গ্রহন করিয়াছিলেন। নবাব, দেবীর নিকট বসিয়া বলিলেন। "আয়েশা, তোমার কোন কষ্ট হয় নাই তো?" আয়েশা। "আমি আপনার অনুগ্রহে যথেষ্ট সুখে আছি।" নবাব। "গৌরী শঙ্করকে পাইয়াছ কি?" আয়েশা। "পাইয়াছি। আর আমার জন্য আপনাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না।—একদিন জগৎসিংহ আসিয়া ছিল; আমি তাহাকে দেখা দিই নাই।"

নবাব। "গৌরীশঙ্করকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে পারিলে কি?" আয়েশা। "তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে, অধিক বেগ পাইতে হয় কি?" এইরূপ আলাপ পরিচয়ের পর নবাব ওস্মানখাঁ আয়েশার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই রাজপুত্র এবং এই নবাবের আগমনের পর হইতে, সেই দেবতার সম্মান জনসাধারণ্যে আরও বাড়িয়া গেল। এখন সে স্থলে রেল গমন করিয়াছে।

পাঠক! আয়েশা একাকিনী সেই বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন। অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে ওস্মানখাঁ, এই গোর নির্ম্মাণ করিয়া জীবন্ত আয়েশাকে এই গোরে সমর্পণ করিয়াছিলেন।—এবং তাঁহারই কৌশলে আয়েশা গৌরীশঙ্করের কুলচী ও কাহিনী জানিয়াছিলেন।—আর একা আয়েশাই তাড়কা ঠাকুর, সেই দাসীরূপী সন্ন্যাসিনী এবং তাড়ক ঠাকুরের কন্যা সাজিয়াছিলেন। এবং ঐ নলযোগে ঐ মৃত্তিকাবাস হইতে কথা কহিয়া, হিমালয় পর্ব্বত হইতে তাড়কঠাকুর কথা কহিতেছেন বলিয়া, গৌরীর বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। গুণবতী না হইলে দেবী হওয়া কি আর মুখের কথা?"

বহু পরিশ্রমে হল ত্রিজার্জা ইতি,
দেখ যদি ফিরে এতে বাঙ্গালীর মতি।